বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের মোকাবিলা/১

বি আই এফ আর

সম্পর্কে জানার কথা

নাগরিক মঞ্চ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'বি আই এফ আর সম্পর্কে জানার কথা'-র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালের আগস্ট মাসে। প্রায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল প্রথম সংস্করণ। ইতিমধ্যে 'বি আই এফ আর'-এর বয়স হয়েছে ছয় বছর। এই ছয় বছরে শিল্পে রুগ্নতা বেড়েছে। বেড়েছে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের সংখ্যা।

১৯৮৯ সালে সারা ভারতে রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা ছিল ১,৬০,০০০। ১৯৯১-এর মার্চ মাসে ছোট, বড়, মাঝারি রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় ২,২৪,০০০। শুধু পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ বা রুগ্ন শিল্প ৫৪,৭০০। পশ্চিমবঙ্গে ২১৪টি শিল্প-সংস্থা বি আই এফ আর-এ বিচারাধীন। ক্ষতিগ্রস্ত কয়েক লক্ষ শ্রমিক। বি আই-এফ আর চালু হওয়ার পর ছয় বছরে শ্রমিকদের অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। সহায়তাকারী সংস্থা হিসাবে 'মঞ্চ'-ও তাঁদের এই অভিজ্ঞতার শরিক।

বি আই এফ আর নিজেও তার অভিজ্ঞতা ১৯৯২ সালে একটি সমীক্ষা ও সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দিয়েছে। সম্প্রতি (জুলাই ১৯৯৩) ওঙ্কার গোস্বামী কমিটি সরকারের বিদেশী ও বেসরকারি পুঁজিকে প্রকাশ্য তোষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আরো একটি সমীক্ষা এবং সুপারিশ পেশ করেছে। তা নিয়ে মালিক, রাজ্য সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন এবং বি আই এফ আর নানা প্রকাশ্য বাদ প্রতিবাদে সামিল হয়েছে।

বি আই এফ আর বনাম রুগ্ন শিল্পের শ্রমিকদের এই দড়ি টানাটানিতে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকাও এই ক' বছরে আরো প্রকট হয়েছে। জীবিকার লড়াইয়ে সামিল মজদুরদের কর্তব্য স্থির করার জন্য নিজেদের ও অপরের এই অভিজ্ঞতা, সমীক্ষা, সুপারিশ, বিতর্ক সবই চোখের সামনে রাখা দরকার। সেইজন্যই এই পুস্তিকায় সংক্ষেপে বিষয়গুলি পেশ করা হয়েছে।

নাগরিক মঞ্চ পুস্তিকার প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উদ্দেশ্য হিসাবে যা ঘোষণা করেছিল, আজও তা অপরিবর্তিত।

নাগরিক মঞ্চ
সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

কেন আমরা এই বই প্রকাশ করলাম

(প্রথম সংস্করণের ভূমিকা)

এমনটি এক সময় ছিল যখন বিলাতি কোম্পানিতে আপনার আমার প্রতিবেশী, বন্ধুর প্রিয়জন চাকরি পেলে, মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে সুসংবাদ দিতে হাজির হত। আজ সেসব কল-কারখানার শ্রমিক, কর্মচারীরা আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত। কারণ কারখানাটি রুগ্ন বা বন্ধ।

ছাঁটাই হওয়া বন্ধ কারখানার ভুখা শ্রমিকের স্ত্রী-পুত্ররা আজ তিনশ বছরের কলকাতায় মিছিল করে। বারাসাতের সুতাকল শ্রমিকের স্ত্রী কণিকা অনাহারের জ্বালায় বিষ খেয়ে ছোট শিশু সন্তানসহ আত্মহত্যা করে। এ ঘটনা অহরহ ঘটছে।

এমনটা হবে কথা ছিল না।

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর হল। ৪৮ থেকে ৫৫ পর্যন্ত একাধিক সাহেব কোম্পানি খরিদ করল দেশীয় পুঁজিপতিরা।

৮৯ সাল পর্যন্ত অনেকগুলি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, শিল্পনীতি সংক্রান্ত সরকারি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

শিল্পপতিদের চাপে মিশ্র অর্থনীতির চেহারাটা যাই দাঁড়াক না কেন সমস্যা ক্রমাগত বেড়েছে।

ভারত সরকার প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমীক্ষায় জানা যায় যে, ১৯৮৯-এর জুন পর্যন্ত বড়, মাঝারি ও ছোট শিল্প ইউনিট মিলিয়ে রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৮৩টি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতে এগুলির মধ্যে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৬টি কারখানার সুস্থ হওয়ার আশা নেই। ১৯৮৮-র মার্চে সংসদে অর্থমন্ত্রী বলেছেন ৫১ ভাগ আবার লাভজনক হতে পারে। প্রতিদিন প্রায় ৭০টির মত শিল্প ইউনিট রুগ্ন হচ্ছে। সারা দেশে শিল্পে রুগ্নতা থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে ও মহারাষ্ট্রে রুগ্ন শিল্প ইউনিটের সংখ্যা সর্বাধিক। সারা দেশের সমস্ত বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের তিন ভাগের একভাগ পশ্চিমবঙ্গে। আমদানি নীতির চালাও ছাড় দেওয়ার ফলে বিদেশি নির্ভরতা বাড়ছে। ক্রমাগত বিদেশি ঋণ বাড়ছে। এর ফলে স্বাধীনতা বিপন্ন। ক্রমশ হস্তক্ষেপ বাড়ছে নাগরিক

স্বাধীনতার উপর।

একদিকে শ্রমিক কর্মচারীরা মালিকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কর্মহীন হচ্ছেন। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার অর্জিত অধিকারগুলি কেড়ে নিতে জারি করছে একাধিক কালা কানুন।

সংগঠিত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক একজন গণতন্ত্রের গ্যারান্টার। খুব অল্প সংখ্যক মানুষ আজ আধুনিক প্রযুক্তিতে কাজ করে। বন্ধ, রুগ্ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষের বাঁচার অধিকার আজ খর্বিত। কার্যত প্রত্যাহৃত। অসংগঠিত শিল্প-শ্রমিকের মানবিক অধিকার বলে আজ কিছু নেই। বাঁচার জন্য আহার, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যের প্রয়োজনটুকুও এঁরা পাচ্ছেন না। স্বভাবতই বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের সমস্যা শুধু শ্রমিক কর্মচারীদের বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। দেশ, সমাজ, রাষ্ট্রের নীতির ফলে সে সমস্যার উদ্ভব। সমাধানের রাস্তা খুঁজতে হবে সমাজের সর্বস্তরের দেশপ্রেমিক জনগণকে। সম্পদ ছিনতাইয়ের মাধ্যমে যে শিল্পপতিরা শিল্পকে রুগ্ন করছে, আমদানির ঢালাও ছাড়, রপ্তানিতে ভরতুকি দিয়ে দেশের স্বাধীন উদ্যোগ ও একটার পর একটা শিল্পে যারা তালা ঝোলাচ্ছে, ছাঁটাই, বেকারি ও বেগারি সৃষ্টি করে শ্রমজীবী মানুষের আত্মমর্যাদা ও বাঁচার অধিকার যারা কেড়ে নিচ্ছে, এর অনুকূলে যারা সরকারি দমনমূলক আইনের ব্যবহার করছে, তাদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকামী জনগণের সোচ্চার হওয়া জরুরি। এই উদ্দেশ্যেই আমরা গঠন করেছি 'রুগ্ন ও বন্ধ শিল্প শ্রমিক সহায়ক নাগরিক মঞ্চ'। আমাদের কাজ হবে বন্ধ থাকা ও রুগ্নের কারণ অনুসন্ধান। রুগ্ন শিল্পের সমস্যার সমাধান কোন পথে হবে তা খুঁজতে চেষ্টা করা এবং নাগরিকদের তা জানানো।

কেন্দ্রীয় সরকার রুগ্ন শিল্পের বিষয়টি সমাধানে তৈরি করেছেন 'বি আই এফ আর' নামক একটি বোর্ড। আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় দুশর মত ব্যক্তি মালিকানার কোম্পানি কেস বি আই এফ আর-এ ঝুলছে। কয়েক লক্ষ শ্রমিক, কর্মচারীর চাকরি থাকা না থাকার বিষয়টি নির্ভর করছে 'বি আই এফ আর'-এর সিদ্ধান্তের উপর। ইতিমধ্যেই এই বোর্ড রাজ্যের বেশ কয়েকটি ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প ইউনিটকে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে কয়েক হাজার শ্রমিককে বেকার করে দিয়েছে। তাই আমরা বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প বিষয়ে জানান দেওয়ার কাজ শুরু করেছি। এই বইটির মাধ্যমে কে এই বি আই

এফ আর', কি তার ক্ষমতা, কি উদ্দেশ্যে এই 'শিল্প এবং অর্থ সংক্রান্ত পুনর্গঠন পর্ষদ'-গঠন করা হয়েছে, তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। আগামী দিনে আমরা 'নাগরিক মঞ্চে'-র পক্ষে 'বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প সম্পর্কিত' বিষয়ে একাধিক বই প্রকাশ করব। এই সিরিজের প্রথম বইটি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক, কর্মচারীদের জানা, বোঝা ও আন্দোলন সংগঠিত করতে সহায়তা করলে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

নাগরিক মঞ্চ
(বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প শ্রমিক সহায়ক)
আগস্ট ১৯৮৯

১

বি আই এফ আর কী এবং কীইবা তার ক্ষমতা

বি আই এফ আর-এর পুরো নাম বোর্ড ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড ফাইনানসিয়াল রিকনষ্ট্রাক্‌শন। অর্থাৎ শিল্পের আর্থিক ও অন্যান্য পুনর্গঠনের জন্য বোর্ড বা পর্ষদ। বি আই এফ আর তৈরি হয়েছে ১৯৮৫ সালে লোকসভায় পাশ হওয়া সিক ইন্ডাস্ট্রীয়াল কোম্পানীজ (স্পেশাল প্রভিশন) এ্যাকট্ বা রুগ্ন শিল্প কোম্পানীগুলির জন্য বিশেষ বিধি আইন, যার সংক্ষিপ্ত নাম সিকা।

১৯৮৫-তে পাশ হলেও সিকা আইনটি চালু হয় ১৯৮৭-র মে মাস থেকে।

আইনের নামই বলে দিচ্ছে কার জন্য এই সিকা ঃ

* শুধুমাত্র কোম্পানীদের জন্য। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যবসা বা পার্টনারশিপের জন্য নয়।

* শুধুমাত্র শিল্প কোম্পানিদের জন্য—অর্থাৎ কেনাবেচা করা ট্রেডিং কোম্পানির জন্য নয়। সিকা-র আওয়তায় পড়তে হলে কোম্পানির নিজ কারখানা থাকতে হবে।

* সিকা শুধু রুগ্ন শিল্প কোম্পানীদের জন্য। আধা রুগ্নদের জন্যও বটে। "রুগ্ন" মানে কি? সংজ্ঞাটা সিকা আইনের 3 (1) (0) ধারায় খুঁটিয়ে বলা আছে (দ্বিতীয় পরিচ্ছদ দেখুন)। তবে মোদ্দা কথা হ'ল—

যে শিল্প কোম্পানীর জমে ওঠা লোকসান তার মোট শেয়ার পুঁজী (নোট ১) ও সঞ্চিত পুঁজীকে (২) (বা রিজার্ভ) ছাড়িয়ে গেছে এবং যে শিল্প কোম্পানি কমপক্ষে ৭ বছরের পুরানো এবং যে কোম্পানি গত দু বছর পর পর নগদ লোকসান (৩) করেছে—সেই শিল্প কোম্পানীই রুগ্ন।

(১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে রাজ্যসভায় "সিকা" আইনের উপর এক সংশোধনী বিল পাশ হয়ে গেছে। যা আগামী দিনে লোকসভায় পাশ হয়ে গেলে, রুগ্নতার এই সংজ্ঞা কিছুটা পরিবর্তন ঘটবে। এই নতুন সংজ্ঞা অনুযায়ী কোম্পানিটির ৫ বছর বয়সের হলে এবং তার মোট লোকসান মোট সম্পদকে (নেট ওয়ার্থ) ছাড়িয়ে গেলে কোম্পানিকে রুগ্ন বলা হবে।

বছরের পুরানো হওয়া প্রয়োজন নেই বা নগদ লোকসানের শর্তকেও বাদ দেওয়া হয়েছে।)

—ছোট কোম্পানি বা স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি এস এস আই-দের।

—এ্যানসিলারি বা উপাদান বা যন্ত্রাংশ তৈরী করা কোম্পানিদের যাদের যন্ত্রপাতিতে ৫০ লাখ টাকার বেশি লগ্নী।

* আধা রুগ্ন হল সেই কোম্পানি যার শেয়ার ও সঞ্চিত পুঁজির অর্ধেকের বেশী লোকসানে খেয়ে গেছে।

* সব রুগ্ন শিল্প কোম্পানি সিকা-র আওতায় পড়ে না। সিকা আইন বাদ দিয়েছে।

এই সিকা আইন শুরু হবার সময় থেকে বহুদিন পর্যন্ত সরকারি শিল্প কোম্পানিগুলি অর্থাৎ যে সব শিল্প কোম্পানির শতকরা ৫০ ভাগ বা তার বেশি মালিকানা কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের হাতে আছে, তারা 'সিকা' আইনের আওতার বাইরে ছিল। কিন্তু নরসিমা রাও সরকার ১৯৯১ ডিসেম্বরে 'সিকা' আইনের এই ধারাটির সংশোধন করেন। বর্তমানে সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি এর আওতায় এসে গেছে। অর্থাৎ যদি ঐ কোম্পানি বা সংস্থাগুলি রুগ্ন হয়ে পড়ে, তবে বি আই এফ আর-এ যেতে পারবে। সারা দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ৫৭টি সংস্থা বর্তমানে বি আই এফ আর-এ রুগ্ন শিল্প হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

তাহলে রুগ্ন হয়ে যাওয়া এস এস আই বা এ্যানসিলারি কোম্পানিগুলির কি হবে? তাদের জন্য আলাদ ব্যবস্থা।

সিকা আইনে, রুগ্ন শিল্প কোম্পানিগুলির জন্য কি বিধান আছে?

আছে বি আই এফ আর এর ব্যবস্থা।

বি আই এফ আর-এর নিজ বক্তব্য অনুযায়ী এর মূল লক্ষ্য হল—

(১) রুগ্ন শিল্পের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার মূল্যায়ন এবং তার ভিত্তিতে ঐ শিল্পের পুনর্গঠন অথবা বন্ধ (winding up) করে দেওয়া। (২) ব্যক্তিগত ও সরকারি সম্পদের ক্রমান্বয়ে অপচয় বন্ধ করা। (৩) যতদূর সম্ভব চাকুরির সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

বি আই এফ আর তৈরি করবে কেন্দ্রীয় সরকার। তারপর বি আই এফ আর নিজেই তার নিজের নিয়ম-কানুন বানাবে। চলবে সিকা আইন মোতাবেক।

দেশের অন্য কোন আইন তাকে রুখতে পারবে না। হাইকোর্ট তার উপর ইনজাংশন দিতে পারবে না। অপরদিকে বি আই এফ আর যদি হাইকোর্টকে বলে যে অমুক কোম্পানিকে উঠিয়ে দেবার (winding up বা লিকুইডেশনের) (নোট ৪) বন্দোবস্ত কর, হাইকোর্টকে সেই বন্দোবস্ত শুরু করতেই হবে।

বি আই এফ আর-এর কোনও আদেশের বিরুদ্ধে দেশের উচ্চতর আদালতে (হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট) মাত্র দুটি ক্ষেত্রে আবেদন গ্রাহ্য হতে পারে— (১) কোন পক্ষ যদি মনে করে বি. আই. এফ. আর-এর কোনও সিদ্ধান্ত বা 'সিকা' আইনের কোনও ধারা বলে সংবিধান প্রতিশ্রুত কোনও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। (২) কেউ যদি মনে করে বি আই এফ আর তার কোন রায়ে সিকা আইনের সীমানা লঙ্ঘন করেছে। এর বাইরে বি আই এফ আর-এর কোনও সিদ্ধান্তের গুণাগুণ বা যাথার্থ বিচার করার অধিকার দেশের অন্য কোনও আদালতের নেই, একমাত্র সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার ছাড়া, দেশের অন্য সমস্ত আইনের উপর ('ফেরা' 'উল্‌কা', এই দুইটি আইন ছাড়া) 'সিকা' অগ্রাধিকার পাবে।

কোন রুগ্ন শিল্প কোম্পানির কেস বি আই এফ আর-এ গেলে, বি আই এফ আর যদি চায় তাহলে সে কোম্পানি সম্পর্কে সমস্ত মামলা রুখে দিতে পারেন। মালিকের হাত সাফাইয়ের বিরুদ্ধে কর্মীদের মামলা অথবা কোম্পানির বিরুদ্ধে পাওনাদারদের মামলা—যে কোন মামলাই বি আই এফ-আর রুখে দিতে পারে। তেমনি, ধরুন কোনও আদালত বা ট্রাইবুনাল কোনও রুগ্ন শিল্প কোম্পানির ক্ষেত্রে কোনও রায় বা অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে। সেই রায় বা অ্যাওয়ার্ডও বি আই এফ আর হুকুম দিয়ে রুখে দিতে পারে।

কোন কোম্পানি রুগ্ন সেটা বি আই এফ আর জানবে কি করে ?

সিকা আইন বলেছে যে, কোম্পানির পরিচালকরা (বোর্ড অফ ডাইরেকটরস), যদি হিসাব নিকাশ দেখে বুঝতে পারেণ যে সিকা আইন মোতাবেক সে-কোম্পানি রুগ্ন হয়ে গেছে, অমনি তাঁরা বি আই এফ আর-এর কাছে তথ্য প্রমাণ দিয়ে আবেদন করতে বাধ্য। না করলে সাজা হবে।

তেমনি 'আধা রুগ্ন' কোম্পানির পরিচালকদেরও, হিসেব নিকেশ দেখে, বি আই এফ আর-এর কাছে রিপোর্ট (আবেদন নয়) দাখিল করতে হবে।

পরিচালকরা ছাড়া আর কে শিল্প কোম্পানির রুগ্নতার খবর বি আই-এফ আর জানাতে পারে ?

—সরকার, সরকারি ব্যাঙ্ক ও প্রতিষ্ঠানগুলি। (নোট-৫) রুগ্নতা জানাবার অধিকার কিন্তু কর্মচারী বা ইউনিয়নগুলিকে দেওয়া হয়নি।

রুগ্নতার আবেদন পেয়ে বি আই এফ আর কি করবে ?

* প্রথমে সে তদন্ত করবে বা করাবে।

* সঙ্গে সঙ্গে সে পরিচালক মণ্ডলীতে তার প্রতিনিধি বসাতে পারে।

* তদন্তের ভিত্তিতে বি আই এফ আর—

● বলতে পারে, এখন যারা কোম্পানি চালাচ্ছে ; তারাই চালিয়ে যাকে কোম্পানিকে সুস্থ করে তোলার জন্য।

অথবা ● কোম্পানিটাকে অন্য কোনও কোম্পানির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোক (Merger)

অথবা ● কোম্পানির পুরোটা বা অংশ বিশেষ আলাদা আলাদা করে বেচে দিতে পারে, লীজও দিতে পারে। এবং এ ক্ষেত্রে কর্মী সমবায়কেও বিক্রি করা বা লীজ দেবার কথা আছে সিকা আইনে।

অথবা বি আই এফ আর হাইকোর্টকে বলতে পারে : কোম্পানি তুলে দাও অর্থাৎ Winding up করো।

এই নির্দেশ হাইকোর্টকে শুনতেই হবে। আবার বিক্রিটা যদি 'চালু সংস্থা' (Going Concern) হিসাবে করা হয় তবে কারখানা অটুট রেখে ক্রেতাকে কারখানা চালাবার দায়িত্ব নিতে হবে। তবে ক্রেতার উপর পুরনো পাওনাগণ্ডা মেটাবার কোনো দায় থাকবে না। এ ছাড়া বি আই এফ আর পুনরুজ্জীবনের স্কীম কার্যকরী করার ভার কর্মী সমবায়কেও দিতে পারে। বি আই এফ আর-এর নিজের কথায় : "সিকা আইন বি আই এফ আর-কে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছে, যেখানে যেখানে সম্ভব 'বোর্ড' যেন শ্রমিক সমবায়কে উৎসাহ প্রদান করে"।

এখানে উল্লেখযোগ্য, বি আই এফ আর যদি কোনও কারখানা গুটিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে কোনও পক্ষেরই সম্মতির প্রয়োজন নেই।

বি আই এফ আর এক ধরনের আদালত। তার শুনানি পত্তর হয়। তবে সে শুনানিতে উপস্থিত থাকার জন্য বি আই এফ আর-এর মঞ্জুরি চাই। বি আই এফ আর-এর বিধিমাফিক যে কোন কর্মী বা কর্মীবৃন্দ শুনানিতে উপস্থিত থাকার জন্য আবেদনকরতে পারেন। বি আই এফ আর-এর অনুমতি

পেলে শুনানীতে সেই কর্মী বা কর্মীরা বক্তব্য রাখতে পারেন, জেরা করতে পারেন এবং দলিল দস্তাবেজের কপিও পেতে পারেন।

কোনও রুগ্ন শিল্প কোম্পানি সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত—সে কোম্পানিকে বাঁচিয়ে তোলার পরিকল্পনা অথবা সে-কোম্পানি তুলে দেবার (Winding up, Liquidation) সিদ্ধান্ত, বি আই এফ আর সাধারণভাবে বিজ্ঞাপিত করবে। বাঁচিয়ে তোলার পরিকল্পনাকে "স্কিম" বলা হয়।

"স্কিমে" বহু ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের কথা থাকতে পারে—

টাকা কোথা থেকে আসবে, খরচ কমানোর জন্য, বিক্রি ও লাভ বাড়ানোর জন্য কি করা হবে, পরিচালনা কে বা কারা করবে, ঋণ কি করে শোধ হবে ইত্যাদি, এই স্কিমের সারাংশ জানিয়ে বি আই এফ আর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়। পশ্চিমবঙ্গের কোম্পানি হলে একটা বাংলা কাগজেও বিজ্ঞাপন দিতে হবে।

সেই বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে কর্মী তথা কর্মী ইউনিয়ন বি আই এফ আর-এর কাছে তাদের মতামত বা আপত্তি জানাতে পারে। তবে আপত্তি জানাবার সময় সর্বদাই তাঁদের মাথার উপর একটা খাঁড়া ঝোলে: বি আই এফ আর যদি মনে করে যে তার তৈরি স্কিম চালু করা যাবে না, তাহলে কিন্তু Winding up-এর হুকুম দিয়ে দিতে পারে। এ ঘটনা ঘটেছে।

পরিচালক বা মালিকপক্ষের মুখোমুখিও বি আই এফ আর-এর কিছু ক্ষমতা আছে। বি আই এফ আর তাদের আরো টাকা ঢালতে বলতে পারেন। কিন্তু মালিক যদি বলে "দেবো না", তখন বি আই এফ আর তাদের বাধ্য করতে পারে না। যেমন এম এম সি-র ক্ষেত্রে মহিন্দ্র যেই টাকা দিতে রাজী হ'ল না, ওমনি বি আই এফ আর, এম এম সি-কে উইন্ডিং আপ-এর হুকুম দিলেন।

"বি. আই. এফ. আর-এর কাজকর্ম সম্পর্কে বিচার-বিবেচনার সময়ে একটা দরকারি কথা মনে রাখতে হবে। যেখানে কারখানার পরিচালকদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা তার রয়েছে, সেখানে সরকারি ব্যাঙ্ক, অর্থ লগ্নী সংস্থাগুলি সম্পর্কে কার্যত কোন ক্ষমতাই তার নেই। ব্যাঙ্ক বা অর্থ লগ্নীকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চালু পুঁজি বা টার্ম লোনের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বি আই এফ আর-এর বাধ্যতা-

মূলক হুকুম জারি করার কোন ক্ষমতা নেই।"

[ইনডাস্ট্রিয়াল সিকনেস : কেস স্টাডিস ভলুম-১, পার্ট-১]

বি আই এফ আর আইনত যাদের পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনার খসড়া পাঠাতে বাধ্য নয় (এবং নিজে থেকে পাঠায়ও না) এ-রকম কোনও পক্ষও বি আই এফ আর প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে হাজির থাকতে পারে। যেমন শ্রমিক সংগঠন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট নাগরিক সংস্থা ইত্যাদি। কিন্তু তার আগে শুনানীতে হাজির হয়ে সওয়াল জবাবে অংশ নিতে পারে বা দলিল দস্তাবেজের কপি নিতে পারে। কিন্তু আবেদনের মাধ্যমে বি. আই. এফ. আর-এর অনুমতি পেলেই তবে তা সম্ভব। বি. আই. এফ. আর ইচ্ছে করলে এই আবেদন খারিজ করেও দিতে পার। এই সুযোগ গ্রহণ করে বহু শ্রমিক সংস্থা। নাগরিক মঞ্চ বহু রুগ্ন কারখানার ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য রেখেছে, দলিল দস্তাবেজের নকল পেয়েছে।

সিকা আইনে চোর পরিচালক তথা মালিকাদের চিহ্নিত করা বা শাস্তি দেবার কথাও আছে। তবে, উইন্ডিং আপ-এর ক্ষমতা যত পরিষ্কারভাবে বি আই এফ আর-কে দেওয়া হয়েছে, সে ভাবে এই ক্ষমতা দেওয়া নেই।

তাহলে কি বি আই এফ আর-এর সামনে কর্মীরা একেবারে অসহায়? না, আমরা তা বিশ্বাস করি না। কারণ :

১। সিকা আইনে কর্মী সমবায়কে একটা ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। —যদি ঐক্যবদ্ধ হন, কর্মীরা এটা ব্যবহার করতে পারেন। যেমন করেছে কামানি টিউব-এর ইউনিয়ন এবং আরো অনেকে।

২। বি আই এফ আর বিধি-বিধানে, কর্মী ও কর্মী জোটকে কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে। ওয়াকীবহাল ও সাহসী হলে কর্মীরা সেই অধিকার ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য খানিকটা অন্তত লড়তে পারেন।

৩। বি আই এফ আর-এর বিধি এবং Sica আইনে রাজ্য সরকারকে কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে। এটাও কর্মীরা কাজে লাগাতে পারেন।

৪। চোর মালিক-পরিচালকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দেখিয়ে বি আই এফ আর এর সামনে কর্মীরা তাদের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন এবং চোর মালিক পরিচালকদের যাতে চুরি ও শয়তানির মওকা খানিকটা সীমাবদ্ধ হয়, তার চেষ্টাও করতে পারেন বি আই এফ আর-এ স্কিম সংশোধন করিয়ে।

৫। সবচেয়ে বড় কথা, কোনও পুরানো রুগ্ন শিল্প কোম্পানির বেশীর

ভাগ "মধু" থাকে সে কোম্পানির জমি-জায়গায়। এই মধুই সুযোগ মতো কব্জা করতে চায় মালিকরা। বি আই এফ আর যাই করুক না কেন, ঐক্যবদ্ধ কর্মীরা মালিকদের রুখতে পারে।

শিল্প রুগ্নতায় শ্রমিকদের দায়িত্ব সবচেয়ে কম। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমীক্ষা অনুযায়ী ২% ক্ষেত্রে শ্রমিকদের রুগ্নতার জন্য দায়ী করা হয়েছে।

অন্যদিকে এটাও স্পষ্ট যে 'রুগ্ন' শিল্পের পুনরুজ্জীবনে শ্রমিকদের স্বার্থ ও উৎসাহ সবচেয়ে বেশি।

বি. আই. এফ. আর নিজের রিপোর্টে স্বীকার করেছে পুনরুজ্জীবন প্রকল্পে শ্রমিকদের সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে। কারণটা স্পষ্ট, শিল্পে রুগ্নতা ব্যক্তি হিসাবে শ্রমিকের কাছে বাঁচা মরার প্রশ্ন। এই অবস্থায় আশা করা সঙ্গত হবে যে, 'রুগ্ন' শিল্পের পুনরুজ্জীবনে শ্রমিকদের মতামত সবচেয়ে গুরুত্ব পাবে। অথচ 'জনস্বার্থে' রচিত 'সিকা' আইনে আমরা কি দেখছি?

১। কোম্পানির মালিক যখন 'সিকা' আইন অনুযায়ী রুগ্নতার কারণে বাধ্যতামূলক ভাবে বি. আই. এফ. আর-এর এজলাসে যাচ্ছে সেই খবর তারা শ্রমিকদের জানাতে বাধ্য নয়। বি. আই. এফ. আর নিজেও শ্রমিকদের জানাতে বাধ্য নয়।

২। 'রুগ্নতার' সমাধানে বি. আই. এফ. আর যে পরিকল্পনা করবে—তা সে পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনাই হোক আর গুটিয়ে ফেলার পরিকল্পনাই হোক, সেটা শ্রমিকপক্ষ ছাড়া সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকেই জানাতে বাধ্য। অন্যদিকে বি. আই. এফ. আর কোনও 'স্কিম' সমস্ত পক্ষের সম্মতি ছাড়া অনুমোদন করতে পারে না। একমাত্র শ্রমিকদের সম্মতি ছাড়াই স্কিম অনুমোদিত হতে পারে।

৩। বি. আই. এফ. আর-এর শুনানির সময় হাজির থাকার জন্য কারখানার সাথে যুক্ত সমস্ত পক্ষের মধ্যে একমাত্র শ্রমিকদের বিশেষ অনুমতির জন্য আবেদন করতে হবে। শুনানিতে হাজির থাকার কোনো স্বাভাবিক অধিকার তাদের নেই।

৪। পরিচালক মণ্ডলীতে বি. আই. এফ. আর তার প্রয়োজনে নিজস্ব

প্রতিনিধি বসাতে পারে, এ ব্যাপারে শ্রমিকদের সাথে আলোচনা করতে সে বাধ্য নয়।

৫। 'রুগ্ন' শিল্পের শ্রমিকরা দাবী করলেও ইতিমধ্যে প্রকাশিত 'ব্যালান্সশিট' ছাড়া কারখানা সংক্রান্ত অন্য কোনো কাগজপত্র বা তথ্য দিতে মালিকরা বাধ্য নয়।

৬। বি. আই. এফ. আর নিয়োজিত অপারেটিং এজেন্সি' তাদের তদন্তের সময় শ্রমিকদের সাথে কথা বলতে বাধ্য নয়।

উপরে আমরা সংক্ষেপে সিকা আইন ও বি আই এফ আর-এর বিষয়ে বললাম। এরপর দিচ্ছি সিকা আইন ও বি আই এফ আর-এর বিধি বিধানের তর্জমা।

পুস্তিকায় ব্যবহৃত কিছু পরিভাষা

১. ক. প্রিন্সিপাল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি : মূল উৎপাদক শিল্প। যেমন ইস্পাত, পেট্রোলিয়াম শিল্প।

খ. অক্সিলিয়ারি ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি : সহায়ক শিল্প। যেমন : স্টিলের আলমারি, নাইলনের দড়ি ইত্যাদি।

২ ক. লিমিটেড লায়াবিলিটিজ : সীমাবদ্ধ দায়; কোম্পানির ঋণ বা আর্থিক দায়ের ব্যাপারে একজন মালিক ততটুকুই দায়বদ্ধ, ওই কোম্পানিতে তাঁর মালিকানার অংশ যতটুকু।

খ. আনলিমিটেড লায়াবিলিটিজ : অসীম দায়; প্রয়োজনে কোন কোম্পানি যদি টাকা ধার করেও সেই টাকা যদি সময়মতো শোধ করা না হয়, তবে তার দায় মালিক পক্ষের। তার জন্য মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও নিলামে উঠতে পারে।

৩. সোল প্রোপ্রাইটারশিপ : ব্যক্তিগত মালিকানা।

৪. জয়েন্ট স্টক কোম্পানি : যৌথ মালিকানা।

৫. ক. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি : কোম্পানির মালিকানার শেয়ার জনগণের মধ্যে বিক্রি করা যায় না।

খ. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি : কোম্পানির মালিকানার শেয়ার জনগণের মধ্যে বিক্রি করা যায়।

৬. প্রোমোটার : যাঁরা কোম্পানি প্রথম শুরু করেন এবং অন্যান্য অংশীদার যোগাড় করার উদ্‌যোগ নেয়।

২

বি আই এফ আর : আইনের তর্জমা

বি আই এফ আর-এর ভিত্তিআইন—সিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানিজ স্পেশাল প্রভিশনস অ্যাক্ট ১৯৮৫ বা রুগ্ন কোম্পানি আইন।

আইনের লক্ষ্য

মুখবন্ধে বলা আছে :

(১) জনস্বার্থে সময়মতো রুগ্নতা ও সম্ভাব্য রুগ্নতার কারণ বার করার কথা।

(২) সেই রুগ্নতা ঠেকানোর উপায় বা অন্য কোন উপায় দ্রুত নির্ণয় করার কথা।

(৩) সেই নির্ণীত পথ দ্রুত বলবৎ করার জন্য একটি "বিশেষজ্ঞ বোর্ড" বি আই এফ আর।

রুগ্নতা কী ?

রুগ্ন কোম্পানি আইনে 3(1) (0) ধারা অনুসারে—

(ক) যে কোম্পানি অন্তত সাত বছরের পুরনো।

(খ) যে কোম্পানির জমা ওঠা লোকসান তার নেট ওয়ার্থ-এর (অর্থাৎ শেয়ার ক্যাপিটাল এবং রিজার্ভের) চেয়ে বেশি।

(গ) যে কোম্পানি (নগদ) ক্যাশ লোকসান (অর্থাৎ ডিপ্রিসিয়েশন বাদ না দিয়েও লোকসান) করেছে পর পর দু-বছর।

সেই কোম্পানি বি আই এফ আর আইনে রুগ্ন বলে গণ্য।

3(1)F ধারায় বাদ দেওয়া হয়েছে এ্যানসিলারী এবং ক্ষুদ্র (SSI) শিল্পদের।

সিকা আইনের 4নং ধারায় বলা হয়েছে কীভাবে বোর্ড তৈরি হবে ? বি আই এফ আর প্রতিষ্ঠা হবে কেন্দ্রীয় সরকার-এর ঘোষণা মারফত। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগ করবেন বোর্ড সদস্যদের। বোর্ড সদস্য সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ ১৪ জন ও সর্বনিম্ন ২ জন। 4(1)

কারা সদস্য হবেন ?

যাঁরা উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন, সৎ এবং সুনামের অধিকারী, হাইকোর্টের জজ ছিলেন, বা জজ হবার মতো এলেম রাখেন বা যাদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি অর্থনীতি, ব্যাংকিং, শিল্প আইন, শ্রমিক সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো, শিল্প অর্থ-নীতি, শিল্পের ম্যানেজমেন্ট, শিল্প পুনর্গঠন, প্রশাসন, লগ্নী, এ্যাকাউন্ট্যান্সি, মার্কেটিং ইত্যাদি বিষয়ে কম করে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা আছে। [ধারা 4(3)]

বোর্ড সদস্যদের মেয়াদ ৫ বছর। তবে পুনর্নিয়োজিত হতে পারেন। ৬৫ বছর বয়েসের বেশী কেউ বোর্ড সদস্য থাকতে পারেন না। (ধারা 6/2)

বোর্ড সদস্যদের মাইনে দেওয়া হবে "কনসলিডেটেড ফান্ড অব ইণ্ডিয়া" থেকে। (ধারা 9)

কেন্দ্রীয় সরকার বোর্ড সদস্যকে হটিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু শুধুমাত্র সুপ্রীম কোর্টের অনুমতি সাপেক্ষে (ধারা 7/2)

বি আই এফ আর-এর হাতে কেস যাবে কী করে ?

কোন রুগ্ন কোম্পানির ডাইরেকটর বোর্ড বি আই এফ আর-এর কাছে রিপোর্ট করতে বাধ্য যদি ঃ (ধারা 15)।

(১) কোম্পানির অ্যাকাউন্ট (অর্থাৎ ব্যালেন্সশিট্) অডিট হবার পর যদি দেখা যায় যে কোম্পানি 'রুগ্ন' হয়ে গেছে তা হলে অডিট শেষ হবার ৬০ দিনের মধ্যে ডাইরেকটর বোর্ডকে বি আই এফ আর-এর কাছে রিপোর্ট করতেই হবে। (15/1)

(২) ডাইরেকটর বোর্ড যদি বাৎসরিক হিসাব (অ্যাকাউন্ট) চূড়ান্ত হবার আগেই সিদ্ধান্তে আসেন সে কোম্পানি 'রুগ্ন' হয়ে গেছে তাহলে সেই সিদ্ধান্তে আসার দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ডাইরেকটর বোর্ডকে বি আই এফ আর -এর কাছে আবেদন করতে হবে। (ধারা 15/1)

(৩) 'রুগ্নতার সম্ভাবনাযুক্ত' কোম্পানির ক্ষেত্রেও ডাইরেকটর বোর্ডের দায়িত্ব আছে। যে শিল্প কোম্পানির জমে ওঠা লোকসান তার শেয়ার ক্যাপিটাল ও রিজার্ভের অর্ধেক বা তার বেশী হয়ে গেছে সেই কোম্পানিই হল "আধা রুগ্ন" (ধারা 23/1)। 'আধারুগ্ন' কোম্পানির ক্ষেত্রে, ডাইরেকটর

বোর্ড বি আই এফ আর-এর কাছে শুধুমাত্র রিপোর্ট দিতে বাধ্য (23/1) বি আই এফ আর-এর হাতে কোম্পানি রিপোর্ট ন্যস্ত করতে তারা বাধ্য নন। রিপোর্ট না দিলে ডাইরেকটরদের ৬ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে এবং জরিমানা হতে পারে (23/3)।

ডাইরেকটর বোর্ড ছাড়াও রুগ্ন কোম্পানির ব্যাপার বি আই এফ আর-এর হাতে ন্যস্ত করতে পারে (ধারা 15/2) ঃ

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার।

(খ) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া।

(গ) রাজ্য সরকার—যদি সেই রাজ্যে রুগ্ন কোম্পানির কোন কারখানা থাকে। (15/2A)

(ঘ) ব্যাঙ্ক ও ফিনান্স সংস্থা—যদি তারা রুগ্ন কোম্পানিটিকে টাকা ধার দিয়ে থাকে (15/2A)।

BIFR-এর ক্ষমতা

(ক) BIFR নিজেকে ভাগ করে নিয়ে একাধিক বেঞ্চ সৃষ্টি করতে পারে। প্রতি বেঞ্চে কম করে ২ জন সদস্য থাকবে। [ধারা 12(1)-এর (2)]

(খ) BIFR নিজেই তার কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি (রুলস্ ও রেগুলেশন) নির্ধারণ করবে। [ধারা 13(1)]

(গ) BIFR-এর সামনে উপস্থিত কোনো কেস কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের স্বার্থ আছে কিনা, তাদের বক্তব্য পেশ করতে দেওয়া হবে কিনা, কোনও সাক্ষীকে তারা প্রশ্ন করবে কিনা, সেটাও ঠিক করবে BIFR (ধারা 13/2)

(ঘ) BIFR-কে একটি দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য করা হবে। (ধারা 14)

(ঙ) BIFR-এর কোনও হুকুমের বা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনও দেওয়ানী আদালতে আপীল করা চলবে না। কোন দেওয়ানী আদালতের কোনও এক্তিয়ারই থাকবে না BIFR-এর কোনো ব্যাপারে। BIFR-এর কোন ক্ষমতার ব্যাপারে কোন আদালত ইনজাংশন জারি করতে পারবে না (ধারা 26)।

(চ) BIFR-এর সামনে কোনও কোম্পানীর কেস এলে সেই কোম্পানি সংক্রান্ত তাবৎ মামলা স্থগিত হতে পারে যদি BIFR সেরকম হুকুম দেয়।

স্থগিত হবে কোম্পানী গুটিয়ে ফেলার (Winding up) কোন ব্যবস্থা। BIFR-এর কোনও অনুমতি ছাড়া সে ব্যাপারে আর এগোবে না (ধারা 22(1)।

(ছ) বি আই এফ আর ঘোষণা করলে কোম্পানির করা কোন চুক্তি, সেটেলমেন্ট বা কোন অ্যাওয়ার্ড স্থগিত হয়ে যাবে। এবং সেই সব চুক্তি বা সেটেলমেন্ট এবং অ্যাওয়ার্ডের ভিত্তিতে যে সব অধিকার, দায়িত্ব ইত্যাদি বর্তেছে সেগুলোও স্থগিত থাকবে। এই স্থগিত অবস্থার মেয়াদ ২ বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং তার পরে ১ বছরের কিস্তিতে স্থগিতাদেশের মেয়াদ ৭ বছর পর্যন্ত টানা যেতে পারে (ধারা 22(3)।

(জ) বি আই এফ আর উপরোক্ত ঘোষণা করলে এমন কি আদালত বা ট্রাইবুনালের হুকুম বা ডিক্রিও স্থগিত থাকবে (ধারা 22(5)A)।

(ঝ) সম্পত্তি বা হিসাবের খাতা সিজ করতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সহ অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটদের বি আই এফ আর হুকুম দিতে পারে।

(ঞ) বি আই এফ আর-এর হুকুমে কোন কোম্পানির ক্ষেত্রে সম্পত্তি বা হিসাবের খাতা সিজ করতে পারে। অন্যান্য সব আইন মুলতুবি থাকবে রুগ্ন কোম্পানির ক্ষেত্রে। শুধু ফেরা এবং উলকা ব্যতিরেকে [ধারা 32(2), (2) (3)]

কেস হাতে নিয়ে বি আই এফ আর কী করবে ?

(১) রুগ্ন কোম্পানির 'কেস' তার হাতে ন্যস্ত হলে BIFR সেই কোম্পানির অবস্থা তদন্ত করবে। [ধারা 16(1)A] এবং কোন কোম্পানি সম্পর্কে খবর চেয়ে বা তার রুগ্নতা সম্পর্কে আপত মতামতের ভিত্তিতেও BIFR তদন্ত করতে পারে কোম্পানির কেস তার হাতে ন্যস্ত হলেও (ধারা 16(1)B)।

(২) প্রয়োজনে BIFR কোন একটি সর্বভারতীয় ফিনান্স সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করতে পারে। আইনে এদেরই বলা হয়েছে Operating Agency [16(2)B এবং 3(1) C]।

(৩) BIFR অথবা ফিনান্স সংস্থা, তদন্ত শুরু হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করবে [ধারা 19(3)]।

(৪) তদন্ত চলাকালীন BIFR সেই রুগ্ন কোম্পানিতে এক বা একাধিক বিশেষ ডাইরেকটর নিয়োগ করতে পারে [ধারা 16(4)]।

(৫) তদন্তের পর BIFR যদি মনে করে যে কোম্পানিটি রুগ্ন হয়ে গেছে, তখন সে লিখিত সিদ্ধান্ত দেবে কোম্পানিটিকে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে "পুনরুজ্জীবিত" করা যাবে কিনা। "পুনরুজ্জীবিত" মানে জমে ওঠা লোকসানকে লাভ মারফৎ মুছে দেওয়া [ধারা 17(2)]।

(৬) BIFR আরোপিত কোন শর্ত যদি সেই রুগ্ন কোম্পানি অমান্য করে, তাহলে BIFR তার আগের হুকুম পরীক্ষা করে নতুন হুকুম দিতে পারে [ধারা 17 (4) 4A]।

(৭) যদি BIFR তদন্তের ফলে মনে করে যে রুগ্ন কোম্পানিটিকে যুক্তি গ্রাহ্য সময়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে না, তাহলে যেকোন সর্বভারতীয় আর্থিক সংস্থাকে সেই কোম্পানি সম্পর্কে একটি স্কিম তৈরি করতে বলতে পারে [ধারা 17(3)]।

স্কিম তৈরি করার হুকুম পেলে সর্বভারতীয় আর্থিক সংস্থা ৯০ দিনের মধ্যে স্কিম তৈরি করে দেবে। [ধারা 14(1)]।

স্কিমে কী থাকতে পারে ?

স্কিমে নিম্নলিখিত বিকল্পগুলি থাকতে পারে

(ক) কোম্পানি পুনর্গঠন [ধারা 18(1)A]।

(খ) ম্যানেজমেন্ট পরিবর্তন [ধারা 18(1)B]।

(গ) অপর কোন কোম্পানির সঙ্গে সংযুক্তিকরণ (Amalgamation) [ধারা 18(1)C]।

(ঘ) রুগ্ন কোম্পানিটির সম্পদাদির অংশবিশেষ বা পুরোটা বিক্রয় বা লিজ [ধারা 18(1)D]।

উপরোক্ত বিকল্পগুলি কার্যকর করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে স্কিমে ব্যবস্থা থাকতে পারে ঃ

রুগ্ন কোম্পানিটির কাঠামো, নাম, রেজিস্টার্ড অফিস, পুঁজি সম্পদ, ক্ষমতা, অধিকার, স্বার্থ, দায়িত্ব, এবং কর্তৃত্ব [ধারা 18(2)A]।

উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে যে স্কিম হবে, তাতে নিম্নলিখিত বিকল্প পদ্ধতি থাকতে পারে।

(ক) রুগ্ন কোম্পানির ব্যবসা, সম্পত্তি এবং দায়-দেনা অপর কোন কোম্পানিকে হস্তান্তর করা [ধারা 18(2)B]।

(খ) রুগ্ন কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড পাল্টানো বা সম্পূর্ণ নতুন

ডিরেক্টর বোর্ড নিয়োগ করা [ধারা 18(2)C]।

(গ) রুগ্ন কোম্পানিকে অপর কোন কোম্পানির সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা [ধারা 18(2) DEFGH]।

(ঘ) রুগ্ন কোম্পানিটির কারখানা (কোন দায় দায়িত্ব ব্যতিরেকে) কোন ব্যক্তি বা কর্মচারীদের সমবায়ের কাছে নির্ধারিত দামে বিক্রয় করা [ধারা 18(2)I]

(ঙ) একইরকমভাবে কোন ব্যক্তি বা কর্মচারী সমবায়ের কাছে রুগ্ন কোম্পানিটির কারখানা লিজ দেওয়া [ধারা 18 (2) J]

(চ) রুগ্ন কোম্পানিটির সম্পদ আলাদা ভাবে বিক্রি করা। এই বিক্রি খোলা নিলাম বা টেন্ডারের মাধ্যমে করতে হবে। [ধারা [18(1)D, 18 (2)K]

(ছ) আবার কোন কোম্পানি বা কোন ব্যক্তিকে (সে ব্যক্তি রুগ্ন কোম্পানির অফিসার বা কর্মচারী হতে পারেন) রুগ্ন কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করার জন্য BIFR সেই শেয়ারের দাম তার চিহ্নিত দামে, বা সেই শেয়ারের আসল মূল্যে (initial value) বা নির্দিষ্ট ছাড় (discount) দিয়ে মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন। BIFR স্কিম তৈরি করলে তার একটা খসড়া কপি পাঠাতে হবে রুগ্ন কোম্পানিটিকে,এক কপি তদন্তকারী আর্থিক সংস্থাকে। সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে, যে কোম্পানি রুগ্ন কোম্পানিটিকে নেবে তার কাছেও এক কপি পাঠাতে হবে [ধারা 18(3)]A

খসড়ার উপর মতামত ও আপত্তির ভিত্তিতে BIFR স্কিম বদলাতে পারে। রূপান্তর করতে পারে [ধারা 18(3)B]

এরপর BIFR স্কিমটিকে অনুমোদন করবে [ধারা 18(4)]

স্কিম অনুমোদিত হলে সেই স্কিম রুগ্ন কোম্পানিটি এবং তার শেয়ার হোল্ডারদের উপর বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে [ধারা 18(8)]।

যদি BIFR মনে করে তাহলে লিখিত হুকুম মারফৎ কোন আর্থিক সংস্থাকে, যাদের বলা হবে operating agency, তার অনুমোদিত স্কিম কার্যকর করার জন্য দিতে পারে [ধারা 18(10)

স্কিমের অনুমোদন

(১) স্কিম যদি পুনরুজ্জীবনের জন্য হয় তাহলে তাতে ঋণদান বা

করজাড় বা অন্য ধরনের সাহায্যের কথা থাকতে পারে। এই সাহায্য আসতে পারে আর্থিক সংস্থা, ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে [ধারা 19(1)]

(2) যে যে তরফ থেকে সাহায্যের কথা বলা থাকবে তাদের কাছেও স্কিম পাঠাতে হবে। এবং স্কিম পাবার ৬০ দিনের মধ্যে তাদের সম্মতি জানাতে হবে [ধারা 19(9)]।

(৩) সবার কাছ থেকে সম্মতি পেলে BIFR স্কিমটিকে মঞ্জুর করবে [ধারা 19(৪)]।

(৪) যদি সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা আর্থিক সংস্থা বা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কোন একটি সংস্থা তার সম্মতি না দেয়, তাহলে BIFR অন্য যে কোন পথ নিতে পারে। এবং সেই পথের মধ্যে রুগ্ন কোম্পানিটিকে গুটিয়ে ফেলাও পড়ে (Winding Up) [ধারা 19 (4)]।

কোম্পানী তুলে দেওয়া (Winding Up)

(১) তদন্তের ভিত্তিতে যদি BIFR মনে করে যে রুগ্ন কোম্পানিটি গুটিয়ে ফেলাই ন্যায় সঙ্গত (is of the opinion that is just and eqitable that the sick industrial company should be wind up) তাহলে BIFR তার মতামত নথীভুক্ত করবে এবং তার সেই মত সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টকে পাঠিয়ে দেবে [ধারা 20(1)]।

(২) BIFR-এর মত পেলে সেই হাইকোর্ট কোম্পানি তুলে দেবার হুকুম দেবে। (The High Court shall order winding up. Proceed with the windidg up [ধারা 20(2)]। এবং হাইকোর্ট গুটিয়ে ফেলার জন্য Liquidator নিয়োগ করবে [ধারা 20(3)]।

(৩) কিন্তু হাইকোর্টে কোম্পানি গুটিয়ে ফেলার প্রক্রিয়া চলাকালীনও BIFR সেই রুগ্ন কোম্পানির সম্পদ বেচে দিতে পারে এবং সেই বিক্রি থেকে যা টাকা উঠবে সেটা হাইকোর্টকে পাঠিয়ে দিতে পারে [ধারা 20(4)]।

আইনে শাস্তির বিধান

BIFR-এর কোন হুকুম বা কোন স্কিম বা রুগ্ন কোম্পানি আইনের ধারা যদি কেউ অমান্য করে অথবা যদি কেউ BIFR বা BAAIFR-এর কাছে

মিথ্যা বক্তব্য বা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ দেয় তাহলে তার তিন বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে এবং সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে [ধারা 33(1)]।

এই শাস্তি বিধান করবে যে কোনও দেওয়ানি আদালত এবং সেই আদালত শাস্তির ব্যাপার হাতে নেবে, শুধুমাত্র যদি BIFR বা AAIFR-এর সেক্রেটারি লিখিত ভাবে অভিযোগ জানান [ধারা 33(1)]।

তদন্ত করার সময় বা স্কিম চালু করার সময় যদি BIFR-এর মনে হয় যে রুগ্ন কোম্পানিটির প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন অতীত বা বর্তমান ডাইরেক্টর বা ম্যানেজার বা অফিসার বা কর্মচারী সেই রুগ্ন কোম্পানিটির টাকা বা সম্পত্তি অপপ্রয়োগ করেছেন বা হস্তগত করেছেন অথবা সেই রুগ্ন কোম্পানিটির সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছেন বা গচ্ছিত অর্থ আত্মসাৎ করেছেন বা তহবিল তছরুপ করেছেন তাহলে BIFR তাঁকে হুকুম দিতে পারে সুদসহ বা সুদ ছাড়া সেই টাকা বা সম্পত্তি রুগ্ন কোম্পানিটিকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ফেরত দিতে। এবং BIFR এই ঘটনাটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও রিপোর্ট করবে [ধারা 24(1)A ও B]।

তার পাওয়া খবর এবং সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে যদি BIFR বোঝেন যে, রুগ্ন কোম্পানিটির কোন ডাইরেকটর বা ম্যানেজার বা কর্মচারী কোম্পানির টাকা সরিয়েছেন বা সেই অপসারণ কোম্পানির স্বার্থ দেখে করা হয়নি বা BIFR যদি সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বোঝেন যে, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ কোম্পানির পরিচালনা কোম্পানির স্বার্থবিরোধীভাবে করেছেন, তাহলে BIFR আর্থিক সংস্থা এবং ব্যাঙ্ককে হুকুম দেবে যাতে আগামী ১০ বছর সেই ব্যক্তি বা তার সঙ্গে যুক্ত কোন ব্যক্তিকে টাকা না দেওয়া হয়। [ধারা 24 (2)]। কিন্তু এইরকম হুকুম দেবার আগে BIFR সেই ব্যক্তিকে তার বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে বাধ্য [24(3)]।

আপিল

BIFR-এর কোন হুকুমের বিরুদ্ধে ৪৫ দিনের মধ্যে অ্যাপেলেট অথরিটির কাছে আপিল করা যাবে। অ্যাপেলেট অথরিটি অবশ্য তার বিবেচনার ভিত্তিতে BIFR-এর হুকুমের ৬০ দিনের পর পর্যন্তও আপিল গ্রহণ করতে পারে [ধারা 25 (1)]।

আপিল পাবার পর অ্যাপেলেট অথরিটি তার বিবেচনা মাফিক আপিল-কারীকে শুনানির সময় দিতে পারে এবং প্রয়োজন মাফিক তদন্ত করে BIFR-এর হুকুম বাতিল করতে পারে অথবা বলবৎ করতে পারে [ধারা 25(2)]।

অ্যাপেলেট অথরিটি

অ্যাপেলেট অথরিটির সংক্রান্ত আইন কানুন ঐ রুগ্ন কোম্পানি আইনেই আছে। কেন্দ্রীয় সরকার অ্যাপেলেট অথরিটিকে ঘোষণা মারফৎ নিয়োগ করবেন। এর পুরো নাম হবে Appellate Autuority for Industrial and Financial Reconstruction অর্থাৎ AAIFR.

AAIFR এ থাকবে একজন চেয়ারম্যান এবং সর্বাধিক ৩ জন সদস্য [ধারা 5(1)]।

(ক) চেয়ারম্যান হবেন সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান বা প্রাক্তন জজ। অথবা এমন কেউ যিনি কমপক্ষে হাইকোর্টে ৫ বছর জজিয়তি করেছেন [ধারা 5(2)]।

(খ) সদস্য হবেন এমন লোক যাঁরা হাইকোর্টের জজ অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব পদে থেকেছেন এবং ৩ বছর BIFR-এর সদস্য ছিলেন [ধারা 5(3)]।

(গ) AAIFR-এর সদস্যরাও ৫ বছরের মেয়াদে নিয়োজিত হবেন এবং ৬৫ বৎসর বয়সের উর্দ্ধে সদস্য থাকতে পারবেন না [ধারা 6(2)]।

(ঘ) AAIFR-এর সদস্যদের বরখাস্তর নিয়মও BIFR-এর মতন [ধারা 7]।

(ঙ) BIFR-এর মত AAIFR একটি দেওয়ানি আদালত [ধারা 14]।

(চ) AAIFR কোন ব্যাপার নিয়ে হুকুম দিলে কোন দেওয়ানি আদালতে কেস বা আপিল করা যাবে না এবং ইনজাংশন আনা যাবে না [ধারা 56]।

প্রয়োগ বিধি

রুগ্ন কোম্পানি আইনে BIFR কে অধিকার দেওয়া হয়েছে ঐ আইন সংক্রান্ত প্রয়োগ বিধি ঘোষণা করার।

2(4) BIFR '86 ঘোষণার মাধ্যমে প্রয়োগ বিধি (রুলস্ এন্ড রেগুলেশন) ঘোষিত হয়েছে।

(১) BIFR-এর অফিস হবে দিল্লিতে (বিধি 4)।

(২) BIFR-এর কাজ হবে ইংরাজী ও হিন্দিতে (বিধি 5)।

(৩) ইংরাজী বা হিন্দী অনুবাদ ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কিছু এলে BIFR সেটা গ্রহণ করবে না (বিধি 6)।

(৪) কোন কোম্পানি তার নিজের ব্যাপার BIFR-এর হাতে ন্যস্ত করতে চাইলে তাকে ফর্ম দশ কপি করে দিতে হবে (বিধি 1 2)।

(৫) BIFR তার খসড়া স্কিম সারাংশ করে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত করবে। সেই বিজ্ঞাপনে BIFR স্কিম সম্পর্কে মতামত অথবা প্রতিবাদ চাইবে। মতামত বা প্রতিবাদ জানাতে পারে ঃ

(ক) রুগ্ন কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার ।

(খ) রুগ্ন কোম্পানির পাওনাদার ।

(গ) রুগ্ন কোম্পানির কর্মচারী (বিধি 29)।

(ঘ) যে কোম্পানির সঙ্গে সংযুক্তিকরণ হবার কথা হয়েছে সে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার, পাওনাদার অথবা কর্মচারী (বিধি 30)।

(৫) দরখাস্ত পাবার পর BIFR সেটা খুঁটিয়ে দেখবে। যদি তাতে কোন ভুল না থাকে, তাহলে একটি কেস নম্বর দেওয়া হবে। [বিধি 19(6)]

(৬) যদি দরখাস্তে ভুল থাকে তাহলে BIFR এর সেক্রেটারি বা রেজিস্ট্রার আবেদনকারীকে ভুল শোধরাবার জন্য সময় দিতে পারে [বিধি—19(5)] সেই সময়ের মধ্যে যদি ভুল শোধরানো না হয় তাহলে রেজিস্ট্রার সেই কেস নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করবেন। [বিধি—19(7)]

(৭) সঠিক দরখাস্ত পেয়ে BIFR বা তার operating agency রুগ্ন কোম্পানির কাছ থেকে আরও বাড়তি তথ্য চাইতে পারে। রুগ্ন কোম্পানির আর্থিক সংস্থা, Bank ইত্যাদির কাছ থেকেও তথ্য দাবী করতে পারে। [বিধি—20(1)]

(৮) ঠিক সেইভাবেই BIFR রুগ্ন কোম্পানির পরিচালকদের আলোচনার জন্য ডাকতে পারে। সরকারি অফিসারদের বা যে কোন লোককেই প্রয়োজন মত আলোচনার জন্য ডাকতে পারে। [বিধি—20(3)

(৯) BIFR যে কোন স্থান পরিদর্শন করতে যেতে পারে এবং তার অফিসার কে তদন্ত করতে পাঠাতে পারে। [বিধি—20(5)]।

(১০) BIFR-এর শুনানির তারিখ জানাতে হবে ঃ

(ক) দরখাস্তকারিকে

(খ) রুগ্ন কোম্পানিটিকে (যদি সে দরখাস্তকারি না হয়)

(গ) অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিদের যাঁরা তাঁদের মন্তব্য বা উপদেশ BIFR-কে পাঠিয়েছেন এবং যাঁরা জানিয়েছেন যে তাঁরা শুনানিতে বক্তব্য বলতে ইচ্ছুক এবং BIFR যাঁদের শুনানীতে উপস্থিত থাকার যোগ্য মনে করেন। [বিধি—20(6)]

(১১) যে ব্যক্তিরা BIFR-কে মন্তব্য বা উপদেশ পাঠিয়েছিলেন এবং শুনানিতে অংশগ্রহণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাঁদের শুনানির কমপক্ষে ১০ দিন আগে একটি লিখিত বক্তব্য পেশ করতে হবে, তাতে থাকবে তাদের বক্তব্যের সারাংশ। [বিধি—20(6)]

(১২) যেখানে কোন রুগ্ন কোম্পানির ব্যাপারে অনেকগুলি লোকের সাধারণ স্বার্থ আছে, তারা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য শুনানিতে পাঠাতে পারেন। তবে এই প্রতিনিধির নাম শুনানির ১০ দিন আগে BIFR-কে লিখিতভাবে জানাতে হবে। [বিধি—২০(7)]

(১৩) যাঁদের শুনানির তারিখ জানানো হয়েছে তাঁদের বক্তব্য BIFR শুনবে। [বিধি—20(4)]

(১৪) কোন একটি রুগ্নকোম্পানির ব্যাপারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের স্বার্থ আছে বলে গণ্য করা হবে :

(ক) রুগ্ন কোম্পানি

(খ) যেখানে রুগ্ন কোম্পানিটির অপর কোন কোম্পানির সঙ্গে সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব আছে, সেই কোম্পানি।

(গ) যে কোন শেয়ার হোল্ডার।

(ঘ) যে কোন কর্মচারী [বিধি—2(4)]।

(১৫) তদন্ত

কেস হাতে পেয়ে BIFR তদন্ত করবে অথবা কোন operating agency-কে দিয়ে তদন্ত করাবে। [বিধি—21(A-B)]

BIFR তার নোটিশের মাধ্যমে নিম্নলিখিত আর্থিক সংস্থা ও ব্যাঙ্ককে operating agency হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

(ক) I D B I বোম্বাই

(খ) I C I C I বোম্বাই

(গ) I F C I দিল্লি

(ঘ) I R B I কলকাতা

(ঙ) State Bank of India বোম্বাই

(চ) Bank of Baroda বরদা

(ছ) Punjab National Bank চণ্ডীগড়

(জ) Central Bank of India বোম্বাই

(ঝ) Canara Bank ব্যাঙ্গালোর

তদন্তের ভিত্তিতে যদি BIFR মনে করে যে কোম্পানিটি SICA আইন মোতাবেক রুগ্ন নয় তাহলে BIFR কেসটি বাতিল করবে। [বিধি—24]

(১৬) স্কিম

BIFR এর দেওয়া দিক নির্দেশ মাফিক operating agency স্কিম তৈরি করবে।

প্রয়োজনে BIFR স্কিম তৈরির সময় বাড়াতে পারে। [বিধি—27]

Operating agency-র কাছ থেকে স্কিম পেয়ে BIFR একটি খসড়া স্কিম তৈরি করবে। এবং তার কপি পাঠাবে রুগ্ন কোম্পানি ও operating agency-কে।

যেখানে স্কীমে অপর কোন কোম্পানির সঙ্গে সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব থাকবে সেখানে অপর কোম্পানিটির কাছেও প্রস্তাবিত স্কিমের কপি পাঠানো হবে। [বিধি—24]

খসড়া স্কিমের সংক্ষিপ্ত বয়ান BIFR সংবাদপত্র এবং পত্রিকায় প্রকাশিত করবে। সেই বিজ্ঞাপনে BIFR নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেয়ার হোল্ডার, পাওনাদার এবং কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রস্তাব এবং আপত্তি চাইবে [বিধি—29]।

উপরোক্ত প্রস্তাব এবং আপত্তি BIFR বিবেচনা করবে। যেখানে খসড়া স্কিমে সংযুক্তিকরণের ব্যাপার আছে, সেখানে অপর কোম্পানিটির শেয়ার হোল্ডার, পাওনাদার এবং কর্মচারীদের অভিমত ও আপত্তি জানানোর অধিকার থাকবে। [বিধি—29] এবং সেই কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভার স্কিমটিতে অনুমোদন করতে হবে। [বিধি—31]

BIFR স্কিম সংশোধন করতে পারে। অথবা নতুন স্কিম তৈরি করাতে পারে। অথবা স্কিমটিকে অনুমোদন করতে পারে [বিধি 32, 33]।

যেক্ষেত্রে স্কিমে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার, আর্থিক সংস্থা ইত্যাদির ঋণ, ছাড় বা ত্যাগ (sacrifies) করার ব্যাপার আছে, সেক্ষেত্রে তারা রাজি হলেই স্কিম অনুমোদন করবে। [বিধি—34(1)]

(১৭) অধিকার

যাঁরাই BIFR-এর শুনানীতে অংশগ্রহণের অধিকার পেয়েছেন তাঁরা সেক্রেটারির কাছে আবেদন করলে কেস সংক্রান্ত সমস্ত দলিল ইত্যাদি দেখতে পারবেন এবং বিধিবদ্ধ ফি দিয়ে কপি পেতে পারবে। [বিধি—38(1)]

এমন কি যাঁরা শুনানিতে অংশগ্রহণকারি নয় তারাও গ্রহণযোগ্য কারণ দেখালে উপরের অধিকার পেতে পারেন। [বিধি—38(1)]

BIFR-এর ফি হল ঃ

(ক) পড়ার জন্য (Inspection) ঘন্টায় ২০ টাকা।

(খ) কপির জন্য ফোলিও পিছু ৫ টাকা।

(গ) যদি Statement বা সংখ্যা টাইপ করতে হয় তাহলে ফোলিও পিছু ১০ টাকা।

বি আই এফ আর-এর বিচার প্রক্রিয়া (এক নজরে)

* 'সিকা' আইনের 3(1)(c), 3(1)(f) ধারায় কোন্ কোন্ শিল্প এই আইনের আওতায় রয়েছে তার হদিশ পাওয়া যাবে।

* 3(1)(o) ধারায় রয়েছে 'রুগ্ন' কারখানার সংজ্ঞা।

* 15(1) ধারানুযায়ী কোনো কারখানা 'রুগ্ন' হলে মালিক ৬০ দিনের মধ্যে বি আই এফ আর-কে জানাতে বাধ্য।

*15(2) ধারানুযায়ী ব্যাঙ্ক, রাজ্য সরকার, সরকারি অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলিও তাদের নিজেদের উদ্যোগে বি আই এফ আর-কে সে খবর জানাতে পারে।

* 16(2) ধারানুযায়ী বি আই এফ আর খবর পেলে নিজস্ব সূত্রে বা 'অপোরেটিং এজেন্সি' নিয়োগ করে প্রথমে ৬০ দিনের মধ্যে যাচাই করবে কারখানাটা সত্যিই 'রুগ্ন' কিনা ?

* 17(1) ধারানুযায়ী তদন্তের শেষে 'বোর্ড'কে লিখিতভাবে জানাতে হবে সেই কোম্পানি ৭ বছরের মধ্যে তার পুরানো লোকসান মিটিয়ে লাভের মুখ দেখতে পারবে কিনা ? এই পর্যায়ের পুনর্গঠনের জন্য কোম্পানির নিজস্ব

কোনো পরিকল্পনা থাকলে সেটা বিচার বিবেচনা করা হয়। সমস্ত পক্ষকে নিয়ে বি আই এফ আর দপ্তরে আবার শুনানি চলে।

* 17(2) ধারানুযায়ী পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনায় সব পক্ষের সম্মতি থাকলে অনুমোদন দিতে পারে। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই অনুমোদিত পরিকল্পনা সফল হয় তো ভাল, না হলে সময় শেষে আবার তাকে বি আই এফ আর-এর দ্বারস্থ হতে হবে।

* 18 ধারানুযায়ী যদি কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনো প্রস্তাব না থাকে বা থাকলেও বাস্তবোচিত নয় বলে বিবেচিত হয়, তবে জনস্বার্থে বোর্ড 17(3) ধারায় 'অপারেটিং এজেন্সি' নিয়োগ করতে পারে।

* 18(c) ধারানুযায়ী 'অপারেটিং এজেন্সি' ৯০ দিনের মধ্যে একই ধারায় উল্লিখিত নানান ধরনের এক বা একাধিক স্কিম সুপারিশ করতে পারে। সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সংশোধিত বা অন্য কোনো প্রস্তাবিত পরিকল্পনা সবার সম্মতি অর্জন করে, 'যত শীঘ্র সম্ভব' বি আই এফ আর।

* 18(4) ধারানুযায়ী সেটি অনুমোদন করতে পারে, যদি তা হয় তবে সংশ্লিষ্ট সম্মতি দানকারি সব পক্ষকে সেটি কার্যকর করতে হবে।

* 20 ধারানুযায়ী কোনো পক্ষের প্রস্তাবই শেষ পর্যন্ত যদি সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত না হয়, বি আই এফ আর কোম্পানিকে গুটিয়ে ফেলার আদেশ দিতে পারে।

* 20(1) ধারানুযায়ী গুটিয়ে ফেলার মতামত জানিয়ে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারে।

* 20(2) ধারানুযায়ী বি আই এফ আর নিজেই কোম্পানির সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে বিক্রয় লব্ধ অর্থ পাওনাদারদের মধ্যে (যার মধ্যে শ্রমিকদের পাওনা পড়ে) বিতরণ করার জন্য হাইকোর্টে পাঠিয়ে দিতে পারে।

* কোনো পুনরুজ্জীবন স্কিম বা গুটিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত বি আই এফ আর-কে কতদিনের মধ্যে নিতে হবে, সেটা নির্দিষ্ট করে বলা নেই। কাজেই সমস্ত পক্ষকে একমতে আনার জন্য বি আই এফ আর-এর সামনে চিঠিপত্রের মাধ্যমে বা এজলাসে শুনানির মাধ্যমে বহুদিন ধরেই এই আলোচনা চলতে পারে।

৩

সিকা আইন ও বি আই এফ আর কী করে এলো

১৯৭০ সালের জুলাই মাসে শিল্পে রুগ্নতার ক্রমাগত বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, আই ডি বি আই, এল আই সি এবং ব্যাঙ্কগুলির যৌথ সভা হল কলকাতায়, পূর্বাঞ্চলের রুগ্ন শিল্পের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে। কেন্দ্রীয় 'একটি এজেন্সি' গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এই পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হল ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রাকসন ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া' (আই আর সি আই পরবর্তী সময়ে যা আই আর বি আই বলে পরিচিত)।

১৯৮২-র মধ্যে সারা দেশে ২০৫টি রুগ্ন শিল্প ইউনিটকে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে আই আর বি আই পরিচালনায় সহযোগিতা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে ১১৬টি ইউনিট আই আর বি আই-এর অধীনে ছিল। তার মধ্যে মাত্র ৩৭টি ইউনিটকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৭৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া একটি স্টাডি গ্রুপ তৈরি করে যা 'ট্যাণ্ডন কমিটি' নামে পরিচিত।

রুগ্ন শিল্পগুলিতে ব্যাঙ্কগুলির ধার দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং শিল্পগুলিতে পরিচালনায় ব্যাঙ্কের অংশগ্রহণ নিয়ে একটি 'গাইড লাইন' প্রণয়ন করা হয়।

১৯৭৮ সালে শিল্পে রুগ্নতার কারণ অনুসন্ধানে ৩৭৮টি বড় ইউনিট নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক সমীক্ষা চালায়।

রুগ্নতার কারণ	কতগুলি রুগ্ন শিল্প ইউনিট	সর্ব মোটের মধ্যে শতাংশ
(ক) পরিচালনার অযোগ্যতা	১৯৭টি ক্ষেত্রে	৫২%
(খ) বাজার-এর অভাব এবং পরিবেশগত কারণে	৮৬ „ „	২৩%
(গ) প্রযুক্তিগত এবং পরিকল্পনার দোষে	৫২ „ „	১৪%
(ঘ) পরিকাঠামোগত (যেমন বিদ্যুৎ, কাঁচামাল-এর সংকট ইত্যাদি)	৩৪ „ „	৯%
(ঙ) শ্রমিক অসন্তোষ	৯ „ „	২%
	৩৭৮ „ „	১০০%

উপরোক্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে ১৯৮১ সালের ১৪ মে তদানীন্তন আই আর সি আই চেয়ারম্যান টি তেওয়ারির নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি হয়। তেওয়ারি কমিটি ১৯৮৩-তে রুগ্ন শিল্পের সমাধানে যে সুপারিশ করেন, তারই ভিত্তিতে তৈরি হয় 'সিক্ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানিজ স্পেশাল (প্রভিশনস) এ্যাক্ট', ১৯৮৫। এটি সংসদে পাশ হয় ১৯৮৬-র ৮ই জানুয়ারি।

এই 'সিকা' অ্যাক্টের ভিত্তিতে তৈরি হয় ১৯৮৭ সালে 'বোর্ড ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যান্ড ফাইনান্সিয়াল রিকনস্ট্রাকশন' (বি আই এফ আর)।

গত বিশ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার রুগ্ন শিল্পে'র পুনরুজ্জীবনে অনেকগুলি কমিটি গড়েছেন। তাদের কিছু কিছু সুপারিশ কার্যকর করেছেন। কিন্তু রুগ্নতা ভয়াবহভাবে বেড়েছে।

পাঁচ বছর আগে 'বি আই এফ আর' রুগ্ন শিল্প ইউনিট-এর আর্থিক এবং পুনর্গঠন-এর উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছিল। এ কয় বছরে হাজারের মতো কোম্পানি বি আই এফ-এর কাছে পুনরুজ্জীবিত হতে গেছে। কিন্তু কি পরিণতি হয়েছে তার একটি পরিসংখ্যান আমরা দিয়েছি (সারণি দেখুন)।

স্বাধীনতার পর দেশে প্রথম শিল্পনীতি ঘোষিত হয় ১৯৪৮ সালে নেহেরুর আমলে। শেষ নীতিটি ঘোষিত হয় ১৯৯১ সালে নরসিমা রাও সরকারের আমলে—যা নয়া শিল্পনীতি নামে পরিচিতি লাভ করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের রুগ্ন ইউনিটগুলি বি আই এফ আর-এর কাছে প্রেরণের উদ্দেশ্যে 'সিকা' আইনের সংশোধন করেছেন।

এখন অনেক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন এবং শ্রমিক নেতারা বলছেন, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে 'বোর্ডে'র কাছে পাঠানো হচ্ছে আসলে শিল্পগুলি তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তাই তারা সংসদের ভিতরে ও বাইরে 'সিকা' আইনের সর্বশেষ সংশোধনীটির প্রতিবাদ করছেন।

পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের ২০৪টি বড় মাঝারি শিল্প ইউনিটকে বি আই এফ আর-এ পাঠানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বি আই এফ আর পশ্চিমবঙ্গের ২৯টি শিল্প সংস্থাকে একেবারে তুলে দিতে বলেছে (Winding up)। যার ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। অন্যদিকে বোর্ড এ রাজ্যের ২৩টি পুনরুজ্জীবন প্রকল্পকে চার বছরে অনুমোদন দিয়েছে।

সারা দেশে কেন্দ্রীয় সরকার ৫৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ইউনিটকে রুগ্ন শিল্প ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি ইউনিট রয়েছে।

রুগ্নতা, সিকা, বি আই এফ আর—গোস্বামী কমিটির রিপোর্টে

১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে ওঙ্কার গোস্বামীর নেতৃত্বে অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, ব্যাঙ্ক আইন ইত্যাদি বিষয়ে ৭ জনের এক বিশেষজ্ঞ কমিটি (দ্য কমিটি অন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকনেস অ্যান্ড কর্পোরেট রিস্ট্রাকচারিং) শিল্পের রুগ্নতা দূর করা সম্পর্কে তাঁদের মতামত ও সুপারিশসহ একটি রিপোর্ট পেশ করেন। অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকার এই কমিটিকে এ বছরেরই এপ্রিল মাসে নিয়োগ করেন। এই কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত এখনও জানা যায়নি। তবে কমিটি তার রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ করেছে, ১৯৯১-র জুলাইয়ে ঘোষিত সরকারের নয়া শিল্পনীতির দৃষ্টি-ভঙ্গী ও বাজাজ কমিটি ও নরসিংহ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেই তাঁরা তাঁদের রিপোর্ট তৈরি করেছেন।

সিকা আইন ও বি আই এফ আর-এর কর্মধারায় নানা পরিবর্তনের প্রস্তাব আছে। সুপারিশগুলি বেশ চাঞ্চল্যকর। ট্রেড ইউনিয়ন, রাজ্য সরকার এবং বি আই এফ আর স্বয়ং প্রকাশ্যে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। হৈ চৈ হচ্ছে। কমিটির সদস্যরা তাঁদের মতামত জানানোর জন্য বিভিন্ন রাজ্যে যাচ্ছেন। গোস্বামী কমিটির রিপোর্টের অংশবিশেষ এখানে দেওয়া হল।

রুগ্নতা কোথায়—কতটা ব্যাপক ?

বি আই এফ আর-এর নিজের রিপোর্টের চেয়ে গোস্বামী কমিটির রিপোর্টে রুগ্নতা-ব্যাপ্তির আলোচনার আরও স্পষ্ট ছবি আছে। তাই আমরা এখানে কমিটির 'সুপারিশ' উল্লেখ করছি।

কত পরিমাণ লগ্নী রুগ্ন শিল্পে আটকে আছে তাকে রুগ্নতা বোঝার সূচক ধরে নিয়ে এঁরা জানিয়েছেন ১৯৮২-৮৯ সাল পর্যন্ত রুগ্ন শিল্পগুলিতে বকেয়া ঋণের পরিমাণ ২৫৮ কোটি টাকা থেকে ৯৩৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। অর্থাৎ বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১৮·৪%। ১৯৮৯ সালে এর ৭৫ ভাগই ছিল বড় ও মাঝারি শিল্প। বড় ও মাঝারি শিল্পে রুগ্নতার সংখ্যা ৪·৮% হারে বেড়েছে। কিন্তু বকেয়া ঋণ বেড়েছে বছরে ১৭·১৫% হারে। মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বাদ দিলে ঋণ বৃদ্ধির হার বার্ষিক ২১%। কমিটি এই হিসেব বৎসর অনুযায়ী ভেঙে ভেঙে দেখিয়েছেন। ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক হিসেব

অনুযায়ী সমস্ত শিল্প মিলে যত বকেয়া ঋণ আছে, শুধু রুগ্ন শিল্পে তার ৪·১৩% রয়েছে। অন্যদিকে শিল্প অনুযায়ী আলাদা আলাদা দেখলে পাট শিল্পে ঐ ভাগ সবচেয়ে বেশি ৫৭·২৩। অর্থাৎ পাটশিল্পের বকেয়া ঋণের অধিকাংশই রুগ্ন চটকলের দরুন। কিন্তু সমস্ত রুগ্ন কোম্পানি মিলে যত বকেয়া ঋণ আছে তার তুলনায় পাট শিল্পের পরিমাণ অনেক কম ৪·৭৫%। এখানে বস্ত্র শিল্পের হার সর্বোচ্চ ৩৩·১০%। তিনটি রাজ্যে মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট—বড় ও মাঝারি শিল্পের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক রুগ্ন শিল্প রয়েছে। ১৯৯০ সালে দেশের মোট বকেয়া ঋণের ৫৪% ছিল এই তিন রাজ্যে। মহারাষ্ট্রে বকেয়া সবচেয়ে বেশি বস্ত্র ও এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের দৌলতে। তারপরই স্থান পশ্চিমবঙ্গের ; প্রধানত পাট ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। গুজরাটের আমেদাবাদে বস্ত্র শিল্প কারখানাগুলোই সেখানকার রুগ্নতার প্রধান শরিক।

রুগ্ন বড় ও মাঝারি শিল্পের রাজ্যভিত্তিক চিত্র—১৯৯১

রাজ্য	বকেয়া ঋণ (কোটি টাকায়)	মোট বকেয়া ঋণের শতকরা ভাগ
মহারাষ্ট্র	১৩০২·০	২৭·৫%
পশ্চিমবঙ্গ	৬৯০·৯	১৪·৬%
গুজরাট	৫৬৮·৭	১২%
মোট	৪৭৭৪·৩	

সিকা, বি আই এফ আর, রুগ্ন শিল্পের পুনর্গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে কমিটির সমালোচনা ও সুপারিশগুলি সংক্ষেপে আমরা নিচে রাখছি।

(১) বি আই এফ আর-এর প্রক্রিয়া অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। এই দেরির প্রধান কারণ দুটো।

(ক) বি আই এফ আর-এর এজলাসে পরিচালিত কার্যবিধির আধা বিচার বিভাগীয় চরিত্র, যা সিদ্ধান্তের সমস্ত স্তরে সব পক্ষের ঐকমত্যের ওপর নির্ভর করে।

(খ) বারবার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত বি আই এফ আর-এর গুটিয়ে ফেলার বদলে পুনরুজ্জীবনের দিকে ঝোঁক। সবাইকে 'একমত' হতে হবে বা সব পক্ষকে 'ত্যাগ' করতে হবে এইদুটো বিষয় রুগ্ন কোম্পানির পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ মতৈক্য সহজে হয়না কাজেই

মতকে জায়গা করে দিতে গিয়ে মামলা বহুবার বি আই এফ আর থেকে অপারেটিং এজেন্সি এইভাবে ঘুরতে থাকে। অন্যদিকে 'ত্যাগের' কথায় নানা রকম উড়ো সমস্যা ডেকে নিয়ে আসে। নানা পক্ষ তাঁদের দায় থেকে মাঝ পথে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। 'ত্যাগ' তো আর কারও কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করা যায় না। পুনর্গঠনের দিকে বি আই এফ-আর-এর পক্ষপাতিত্বের তিনটি গুরুতর ফলাফল (ক) প্রক্রিয়া দীর্ঘতর হয়, (খ) দ্রুত মতৈক্য সৃষ্টির জন্য, সিকা আইনের 20(4) ধারায় কোম্পানি তুলে দেওয়ার ভয় দেখানোর ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়। (গ) প্রমোটার, ব্যাঙ্ক, কখনও কখনও রাজ্য সরকারের অনির্দিষ্টকাল ধরে দেরি করানোর সুযোগ করে দেয়। এদিকে তাকিয়ে গোস্বামী কমিটি স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী দুরকমের পরামর্শ দিয়েছে। স্বল্প মেয়াদী প্রস্তাব হিসেবে জানিয়েছে, বি আই এফ আর ও সরকার উভয়েরই কিছু সাংগঠনিক পরিবর্তন আনা দরকার। এগুলি হল—(ক) বি আই এফ আর-এর শুনানি সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক মঞ্চ হওয়া উচিত। স্পষ্টীকরণ চাওয়া, ব্যাখ্যা, স্কিম সম্পর্কে আপত্তি এসবের জন্য নয়। (খ) কোনও শুনানি সমাপ্ত বা মুলতুবি করে দেওয়ার আগে বি আই এফ আর-এর উচিত তার সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত এক ভাষ্য সবাইকে শুনিয়ে দেওয়া। এই সংক্ষিপ্ত ভাষ্যে মূলত সিদ্ধান্তগুলি এবং কবে পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্তের নকল সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে সেই তারিখও থাকা উচিত।

(গ) প্রতিটি শুনানির পরই প্রয়োজন হলে বেঞ্চ সদস্যদের পরের শুনানির তারিখ ঘোষণা করা দরকার। (ঘ) বি আই এফ আর বেঞ্চের শূন্য পদগুলিকে সরকারের পূর্ণ করা উচিত। অর্থ, কর ও করপোরেট আইনে ৮জন বিশেষজ্ঞ বেঞ্চ সদস্যকে মনোনীত করা দরকার। (ঙ) সর্বোপরি, বি আই এফ আর এর মধ্যে ব্যক্তি ও দক্ষতার মান উন্নত হওয়া দরকার। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা প্যানেল তৈরি করা উচিত এবং শিল্প পুনর্গঠনের জন্য তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত।

গুটিয়ে ফেলার কাজে বি আই এফ আর-এর 20(4) ধারা ঘনঘন ব্যবহার করা উচিত। শুধু আর্থিক দিক থেকে অলাভজনক শিল্পটির বিক্রিকে দ্রুত করার জন্যই নয়, সংশ্লিষ্ট পক্ষকে মতৈক্যে আসতে বাধ্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যও বটে। বেশি বেশি করে 20(4) ধারার মামলা কার্যকর করার জন্য

বি আই এফ আর-এর উচিত দাম ঠিক করার ও নিলামে বিক্রির ব্যাপারে পেশাদার ব্যক্তিদের নিয়োগ করা। পরবর্তীকালে লগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলিও এই ধরনের ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি হতে পারে। গোস্বামী কমিটি জানাচ্ছে, উপরের ব্যবস্থাগুলি খুব তাড়াতাড়ি নেওয়া যাবে কিন্তু সিকা আইনের খোলনলচে না পালটালে শিল্প পুনরুজ্জীবনের পক্ষে আমরা বেশিদূর যেতে পারবনা। রাজ্য সভায় ১৯৯২ সালে সিকা আইনের যে সংশোধনী পাশ হয়েছে সেটা মূল সমস্যায় আঁচড় কাটবেনা। সিকা আইনের সংশোধন এরকম হওয়া উচিত—(ক) সিকা আইনের প্রস্তাবনায় তিনটি শব্দ, প্রতিরোধ-মূলক (Preventive), উন্নতিমূলক (Amereolative) প্রতিকারমূলক (Remedial) বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত। এই তিনটি শব্দই পুনর্বাসন শব্দের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বদলে, মূল এই ধারণাটি এখানে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত যে, সিকার লক্ষ্য হল একটি একক সংস্থার মাধ্যমে রুগ্ন কোম্পানিকে পুনর্গঠিত করার কাজে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাতে হয়, তার সম্পত্তি ও দায় দায়িত্বের বাস্তবসম্মত উপায়ে পুনর্গঠিত করা যায় নতুবা দ্রুত গুটিয়ে ফেলে পত্রপাঠ বিক্রি করে দিয়ে তার অর্থ পাওনাদারদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া যায়। (খ) রুগ্ন কোম্পানির বি আই এফ আর-এ যাওয়া স্বেচ্ছামূলক হওয়া উচিত, বাধ্যতামূলক নয়। সেই মর্মে 15(1) ধারার পরিবর্তন হওয়া দরকার। এতে বি আই এফ আর-এ নথীভুক্ত মামলার সংখ্যা কমে গিয়ে তার কাজের বোঝা কমবে। পাশাপাশি সংস্থা ও ঋণদানকারী নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করে পুনর্গঠনের স্বাধীনতা পাবে। (গ) রুগ্নতা যাতে অনেক আগেই ধরা পড়ে সেজন্য রুগ্নতার সংজ্ঞার পরিবর্তন দরকার। রুগ্নতার নতুন সংজ্ঞা হওয়া উচিত (১) নির্দিষ্ট মেয়াদে (Term loan) ঋণ পরিশোধের সময় ১৮০ দিন বা তার বেশি যা অবশ্যই ঋণদানকারী সংস্থা দ্বারা নির্ধারিত (২) একই নিয়ম নগদ ধার (cash credit) বা চালু পুঁজি (working capital)-র ঋণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে এই সংজ্ঞা কার্যকরি হতে পারে তখনই যখন সিকার ভূমিকা সবচেয়ে মৌলিক প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ থাকবে। (ঘ) রুগ্নতার এই সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর সিকা আইনে এই ব্যবস্থাগুলি থাকা দরকার।

(১) একটি কোম্পানি যখন রুগ্ন হয়ে পড়বে তখন তার বন্ধকী পাওনা-দাররা হাইকোর্ট বা রিকভারি ট্রাইব্যুনালে তার বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করার

জন্য যেতে পারেন। এটা সংস্থার নিজস্ব ইচ্ছার ব্যাপার যে সে বি আই এফ আর-এর কাছ থেকে সীমাবদ্ধ সময় সহ সুরক্ষা পাবে কিনা।

(২) যদি চায় তো বোর্ড তখন পরিচালক, প্রমোটারদের পুনর্গঠন পরিকল্পনা তৈরি করতে বলবে যা বন্ধকী পাওনাদারদের (secured creditors) সন্তুষ্ট করবে।

(৩) যদি বন্ধকী পাওনাদারদের ৩/৪ অংশ ওই পরিকল্পনায় সন্তুষ্ট হয় তবে বি আই এফ আর অনুমোদন দেবে। যদি তা না হয় বি আই এফ আর কোম্পানিকে ৬০ দিনের মধ্যে আরেকটি পরিকল্পনা (Scheme) তৈরি করার সুযোগ দেবে।

(৪) যদি এই পরিকল্পনা ও ৩/৪ অংশ বন্ধকী পাওনাদারদের সন্তুষ্ট করতে না পারে তবে বি আই এফ আর রিকভারি ট্রাইব্যুনালে পাঠাবে (যদি কোম্পানিটি আর্থিক দিক থেকে চালিয়ে যাওয়ার মতো থাকে) বা সিকার 20(4) ধারা অনুযায়ী গুটিয়ে ফেলার সুপারিশ করবে।

(৫) সংশোধিত সিকাতে এই ব্যবস্থা রাখতে হবে যে একবার যদি ১৫০ দিন (৯০+৬০) কোনও পরিকল্পনা অনুমোদন ছাড়া কেটে যায় তবে ধরে নিতে হবে হয় এটা পুনর্গঠনের অযোগ্য বা চালানোর অযোগ্য। যদি প্রথমটা হয় তাহলে সেটা রিকভারি কোর্টে যাবে, যদি দ্বিতীয়টা হয় তবে ২০(4) ধারানুযায়ী গুটিয়ে ফেলতে হবে।

(৬) কেবল বন্ধকী পাওনাদারদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ৫টি রিকভারি ট্রাইব্যুনাল করতে হবে। যাদের চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকবে, অন্য কোনও হাইকোর্টের আওতায় থাকবে না। এখানে ৫০ লক্ষ টাকার কমে কোনও মামলা গৃহীত হবে না।

(৭) সংস্থা গুটিয়ে ফেলার জন্য বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লি, ব্যাঙ্গালোরে পাঁচটি winding up ট্রাইব্যুনাল গঠিত হবে।

সিকা আইন ছাড়া আরও কয়েকটি আইনের পরিবর্তন গোস্বামী কমিটি দাবি করেছে। (১) ফেরা (Foreign exchange regulation act), তাদের পরামর্শ সিকার ক্ষমতা ফেরার উপর প্রতিষ্ঠা করা হোক। (২) আলক্রা (urban land ceiling regulation act), এই আইন বলবৎ থাকার ফলে উদ্বৃত্ত জমি বিক্রির মাধ্যমে, যেখানে রুগ্ন শিল্পের পুনর্বাসন হতে পারত রাজ্য

সরকারগুলির আপত্তির ফলে তা হতে পারছে না। এই আইনের সংশোধন প্রয়োজন যাতে বি আই এফ আর আদেশ দিলে রাজ্য সরকার আপত্তি করতে না পারে। (৩) আই ডি এ (Industrial dispute act)-র 25 (N) ধারায় রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়া কোনও শ্রমিক ছাঁটাই করা যাবে না। 25(0) ধারা অনুযায়ী কোনও কারখানা বন্ধ (closure) করতে হলেও রাজ্য সরকারের অনুমতি চাই। উভয় ক্ষেত্রেই যদি ঐ অনুমতি নিয়ে ছাঁটাই বা ক্লোজার করা হয় তবে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক বা শ্রমিকরা বাড়তি ১৫ দিনের গড়ে মজুরির ক্ষতিপূরণ পাবে। গোস্বামী কমিটির বক্তব্য, রাজ্য সরকারগুলি রাজনৈতিক মুখ রক্ষার জন্য কখনই এই অনুমতি দেয় না। ফলে মালিকরা কারখানা লক আউট করে দেয়। সরকার অনুমতি দিলে শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে যা পেতে পারত, তার থেকেও বঞ্চিত হয়। ফলে তাঁরা "লুম্পেন প্রলেতারিয়েতে পরিণত হয়, ফেরিওয়ালা, সব্জি বিক্রেতা হিসেবে সামান্য আয়ে বেঁচে থাকে।" গোস্বামী কমিটির মতে দেশে এত বেশি শ্রম আইন আছে যে সৎ মালিক হলে বে-আইনিভাবে ছাঁটাই বা ক্লোজার করা সম্ভব নয়। আর অসৎ মালিক হলে সে তার রাজনৈতিক যোগাযোগ ব্যবহার করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য লক্ আউট ঘোষণা করবে, 25(N), 25(0) ধারাকে এড়িয়ে যাবে। সুতরাং একটি ক্ষেত্রে এটি 'অপ্রয়োজনীয়' অন্যক্ষেত্রে কোনও 'লাভ নেই'। কাজেই 'শ্রম শক্তি' পুনর্গঠনের স্বার্থে ঐ দুই ধারা বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত। কমিটির মতে যদিও বে-সরকারি ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বাধার জন্য কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করা যাচ্ছে না—এ রকম উদাহরণ নেই বললেই চলে। তবু রাজ্য সরকারগুলির অস্বাভাবিক মনোভাবের ফলে এই আইন দুটি একটি 'বড় বাধা' হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তারা এই উল্লেখ করেছেন "বে-সরকারি শিল্পের শ্রমিকরা সত্যিকারের 'ত্যাগে' সম্মতি জানিয়ে থাকেন। (ক) উদ্বৃত্ত শ্রমিক ছাঁটাইয়ে, পুনর্বিন্যাসে স্বেচ্ছায় সম্মতি, (খ) প্রায়শই অতি সামান্য ক্ষতিপূরণ ও কিস্তিতে নিতে সম্মতি, (গ) মজুরি বৃদ্ধি বন্ধ, (ঘ) একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নতুন দাবির উপর নিষিদ্ধকরণ, (ঙ) কাজের স্থানের পরিবর্তন, চরিত্র পরিবর্তন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি। প্রমোটার, রাজ্য সরকার, ব্যাংক বা এমনকি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যন্ত যা করে না, সিকা আইনের 17(2) ও 18(4) ধারায় অনুমোদিত পরিকল্পনা শ্রমিকরা মানতে বাধ্য হয়, ও শর্তগুলি মেনে চলে।"

(৪) অসাধু প্রমোটার পরিচালকদের নিয়ন্ত্রণে রাখার নানা প্রস্তাব :

(১) কোম্পানি অ্যাক্ট এইভাবে পরিবর্তন হওয়া দরকার যে ১৮০ দিনের চেয়ে বেশি দিন পাওনা বাকি পড়লে কোম্পানির বন্ধকী পাওনাদাররা পুরো পরিচালক বোর্ড-ই পালটে দিতে পারে। এক্সিকিউটিভ বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে তাদের মনোনীত প্রার্থীকে বসাতে পারে, যদি এই দুটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যকর না হয়, তো চালু পুঁজিসহ সমস্ত অর্থ সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারে, সম্পত্তি ও ইক্যুয়িটি শেয়ার দখল করে নিতে পারে।

(২) তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে যাতে প্রোমোটাররা সরে যেতে না পারে, সে জন্য তাঁদের টাকা জমা না রাখা পর্যন্ত কোনো পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা অনুমোদন পাবে না।

(৩) 'সিকা' আইনের ৩৩ ও ৩৪ নং ধারায় বি আই এফ আর-এর নির্দেশ না মানলে তিন বছরের জেল ও জরিমানার ব্যবস্থা আছে তা ব্যবহার করা উচিত, 'বোর্ড' কখনও এই শাস্তি দেয়নি। নিয়মিতভাবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারিদের বিরুদ্ধে 'বোর্ডে'র এই শাস্তিমূলক ধারাগুলির ব্যবহার করা উচিত। এই প্রসঙ্গে 'গোস্বামী কমিটি' মন্তব্য করেছে "একটি ক্ষেত্রে যখন প্রধান লগ্নীকারি একটি প্রতিষ্ঠান আস্থা হারানোর কারণে পরিচালন বোর্ডের পরিবর্তন চায়, তখন বি আই এফ আর তাকে দলিল ভিত্তিক প্রমাণ দাখিল করতে বলে। যদিও চার বছর আগেই এই প্রোমোটারের বিরুদ্ধে বি আই এফ আর 'সিকা'র 24 ধারায় তছরুপের মামলা করেছিল।"

গোয়িং কনসার্ন : (চালু কোম্পানি)

'গোস্বামী কমিটির' মতে কোনো কারখানা 'গুটিয়ে ফেলার' ক্ষেত্রে তাকে 'চালু সংস্থা' হিসাবে বিক্রির উপর জোর দেওয়ায় এবং শ্রমিক সমবায়-এর হাতে তুলে দেওয়ার পক্ষপাতিত্ব দেখানোয় দাম অনেক কম—অর্থাৎ অর্ধেক পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে যে লাভজনক হবেই তা বলা যায় না। এক্ষেত্রে ভাল হচ্ছে, সবচেয়ে বেশি দাম পাওয়ার চেষ্টা করা। সম্পত্তিগুলিকে আলাদা আলাদা ভাগে (শেড, জমি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) বিক্রি করলেই তা সম্ভব।

ব্যাঙ্ক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি ঃ

গোস্বামী কমিটি অভিযোগ করেছে, 'প্রোমোটাররা' টাকা পাবার যোগ্য কিনা সে সম্পর্কে ব্যাঙ্ক ও লগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলি সামান্য খবরও রাখেন না। তাদের উচিত এ সম্পর্কে একটা সাধারণ তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা। এছাড়াও ব্যাঙ্কগুলি কিভাবে মূল্যায়ন করবে সে সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি পরামর্শ আছে।

রুগ্নতা কেন ?

'গোস্বামী কমিটি'র মতে রুগ্নতার বড় কারণ বিকাশের নামে শিল্প-গুলিকে দরাজ হাতে সাহায্য করা হয়েছে। কমিটি আরো মনে করে কিভাবে বিনিয়োগ করলে সবচেয়ে বেশি নগদ লাভ পাওয়া যাবে তাতে মনোযোগ ছিল না। সেজন্যই অযোগ্য শিল্প উদ্যোগগুলো প্রশ্রয় পেয়ে 'রুগ্ন'তার বন্যা বইয়ে দিয়েছে।

গোস্বামী কমিটির 'সিকা' আইন ও বি আই এফ আর সম্পর্কিত সুপারিশের যে অংশগুলি শ্রমিক ও সাধারণ নাগরিকের জানা দরকার, সেগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হল।

বি আই এফ আর ঃ নিজের চোখে

বি আই এফ আর গঠনের কি উদ্দেশ্য ছিল, তা এই পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে। 'বোর্ড' এর জন্মের চার বছর পর ১৯৯১ এর জুলাই মাসে বি আই এফ আর নিজের কাজের এক মূল্যায়ন ও মতামত প্রকাশ করেছে—'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিকনেস কেস ষ্টাডিজ'। রুগ্ন শিল্পের সমাধানে দেশের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তগ্রহণকারী সংস্থার মতামত আমাদের জানার প্রয়োজন আছে। কারণ এবছরেই 'গোস্বামী কমিটি' বি আই এফ আর ও 'সিকা' আইন সংশোধনে কয়েকটি সুপারিশ করেছে। যা নিয়ে বি আই এফ আর প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছে। বোর্ডের মন্তব্য "'সিকা' আইনে যে সব সংশোধন-এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সেগুলি কার্যকর করা সম্ভব নয় এবং 'গোস্বামী কমিটির' মুখ দিয়ে সরকার কথা বলিয়েছে কারণ বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নী সংস্থা সংস্কারের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারের উপর চাপ দিচ্ছে" ২৪.৮.৯২।

আমরা তাই 'গোস্বামী কমিটি'র সুপারিশগুলির সঙ্গে সঙ্গে 'বি আই এফ আর'-এর রুগ্ন শিল্প সংক্রান্ত মূল্যায়ন ও সুপারিশগুলির নির্বাচিত কিছু অংশ প্রকাশ করলাম।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সারা দেশে বড় ও মাঝারি মোট রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা ছিল ১২৪১। ব্যাঙ্ক ও সরকারি অর্থলগ্নীকারক প্রতিষ্ঠানগুলির মোট ৩৩৮৭·৩৩ কোটি টাকা এই শিল্পগুলিতে আটকে রয়েছে। এই হিসাব উদ্ধৃত করে বি আই এফ আর জানাচ্ছে এই ছবি অসম্পূর্ণ কারণ এতে বকেয়া কর, অপরিশোধিত বাণিজ্যিক ঋণ (যা শিল্প ঋণ এর থেকে আলাদা) এবং শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা এতে ধরা নেই। তাছাড়া দেশে ২,৪০,৫৭৩টি রুগ্ন ক্ষুদ্র শিল্প আরও ২১৪১ কোটি টাকা আটকে আছে। এইসব শিল্পের জন্য (এরা বি আই এফ আরের আওতায় পরে না) বি আই এফ আর এক প্রচলিত বিচার কাঠামোর বাইরে বিকেন্দ্রীক ব্যবস্থার সুপারিশ করেছে (অবশ্য ব্যবস্থার বাস্তব চেহারা কি হবে তার কোনো ইঙ্গিত নেই।

কত মামলা ? কত তাড়াতাড়ি মিটছে ? কিভাবে মিটছে ? এ সম্পর্কে দুটি সারণি দেওয়া হল।

বছর	তালিকাভুক্তি	খারিজ হয়ে গেছে	কার্যকর তালিকাভুক্তি
১৯৮৭	৩১১	৪৩	২৬৮
১৯৮৮	২৯৮	৮০	২১৮
১৯৮৯	২০২	৩৩	১৬৯
১৯৯০	১৫১	২০	১৩১
১৯৯১	৭৩	৪	৬৯
(৩০.৯.৯১ পর্যন্ত)	১০৩৫ (১০০%)	১৮০ (১৮%)	৮৫৫ (৮২%)

এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বি আই এফ আর দাবি করেছে যে, অন্য বিচার বিভাগীয় (কোয়াসী জুডিসিয়াল) সংস্থার তুলনায় তারা অনেক অল্প সময়ে অনেক বেশি হারে মামলার নিষ্পত্তি করেছে। তবে তাদের নিজেদের সন্তুষ্টি মিশ্র চরিত্রের।

রাজ্যসরকার প্রোমোটারদের কাছ থেকে 'সহযোগিতা' পেলে তারা আরও দ্রুত বেশি সংখ্যক মামলার নিষ্পত্তি করতে পারত বলে জানিয়েছে।

পরিকল্পনা রূপায়নের দশা :

বি আই এফ আর এটা সোজাসুজি স্বীকার করেছে, পরিকল্পনা রূপায়নের যে অবস্থা তাতে তারা মোটেই সুখী নয়। বি আই এফ আর-এর নিজেরই মতে অনুমোদিত পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করতে চূড়ান্ত-ভাবে দেরি' হয়ে যায়। বি আই এফ আর দাবি করেছে যে, অনুমোদিত পরিকল্পনাগুলি কিভাবে ও কতটা কার্যকর হয় সে ব্যাপারে তারা সক্রিয়ভাবে নজর রাখে। পরিকল্পনা কার্যকর করতে গিয়ে যদি কোথাও কোনো রদবদল করতে হয় অপারেটিং এজেন্সী বি আই এফ আর-এর অনুমোদন নিয়ে সেটা করতে পারে। এই প্রক্রিয়াতে বি আই এফ আর-এর অভিজ্ঞতা প্রধানত ব্যাংক ও রাজ্য সরকারগুলির দরুনই বিলম্ব হয়।

বি আই এফ আর-এর পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনার সাফল্যের খতিয়ান।

জানুয়ারি ১৯৮৭ থেকে ১৯৯১

	১৭(২) ধারায়	১৮(৪) ধারায়	মোট	শতাংশ
(১) সফল বা সফল হতে পারে—স্কীমের সংখ্যা	৩২	৩০	৬২	৫৫%
(২) ব্যর্থ বা ব্যর্থতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এমন স্কিমের সংখ্যা	২৫	২৫	৫০	৪২%
(৩) সাফল্য/অসাফল্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় হয়নি এমন স্কিমের সংখ্যা	৬১	১০০	১৬১	
মোট	১১৮	১৫৫	২৭৩	

সারণি

সাল

	১৯৮৭	১৯৮৮	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১	মোট
রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানির সংখ্যা	২৬৮	২১৮	১৬৯	১৩১	৬৯	৮৫৫
u/s 17 (2) অনুযায়ী যে-সব শিল্পকে বিচারের জন্য নেওয়া হয়েছিল	৩৬	৩৬	৪০	১৫	১	১২৮
Schemes Sanctioned u/s 18(4) (পরিকল্পনা অনুমোদিত)	১০৯	৬৬	২৫	৩	—	২০৩
Winding up recommended u/s 20(1) (গুটিয়ে ফেলার উপদেশ দেওয়া হয়েছে)	৬৩	৫৫	১৫	৪	—	১৩৭
Sale ordered u/s 20 (4) (বিক্রির আদেশ দেওয়া হয়েছে)	১	—	—	—	—	১
Reference from courts disposed (আদালতের আদেশে ছেড়ে দিতে হয়েছে)	১	—	১	—	—	2
Draft Scheme Circulated as on 30. 6. 91 (খসড়া পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে)	৯	১৪	১৪	৬	—	৪৩
Winding up notices issued as on 30. 6. 91 (তুলে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে)	২৭	২২	১১	৫	—	৬৫
Total (মোট)	২৪৬	১৯৩	১০৬	৩৩	১	৫৭৯

ব্যাঙ্কের ভূমিকা সম্পর্কে বি আই এফ আর বলেছে, তাদের খাতক শিল্প-গুলির সব খবর ব্যাঙ্কের নাগালে। অথচ বকেয়া পাওনা জমেই যাচ্ছে, শিল্পের খাতকের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। রুগ্নতার সম্ভাবনা দেখেও সময় মতো হস্তক্ষেপ না করে টাকা ধার দিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে কোম্পানির লোকসানের পরিমাণ মোট নেট ওয়ার্থের ১৫ থেকে ৩০ গুণ হয়ে যায় যখন আর কোনো উপায় থাকে না।

* দ্রুত পুনরুজ্জীবনের পথে বাধা কোথায় ?

১। প্রোমোটাররা যারা শিল্পকে 'রুগ্ন' হিসাবে বি আই এফ আর-এ নথিবদ্ধ করতে খুব আগ্রহী, একবার নথিবদ্ধ করতে পারলে পাওনাদাররা আর কোর্টের মাধ্যমেও তাদের নাগাল পাবে না। বি আই এফ আরে আওতাভুক্ত শিল্প সাধারণ আদালতের আওতার বাইরে।

২। রাজ্যস্তরের অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ হচ্ছে বেশি সংখ্যক নতুন প্রকল্প অনুমোদন করা। এরপর সেই প্রকল্পগুলো যখন মুস্কিলে পড়ে তখন তারা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে, পুনরুজ্জীবনের বদলে তাড়াতাড়ি গুটিয়ে ফেলার দিকে ঝোঁকে।

৩। রাজ্য সরকার ঠিকমতো সহযোগিতা করে না। রুগ্ন শিল্প সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো নীতি না থাকায় সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এবং কেবলই শুনানি মুলতুবি রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দেরি করায়।

৪। ব্যাংকগুলিও তাদের দেয় অর্থ দিতে এক বছর পর্যন্ত সময় লাগিয়ে দেয়। একসাথে দ্রুত ন্যূনতম পরিমাণ টাকা না দিতে পারলে বিপুল লোকসানে চলা 'রুগ্ন' কোম্পানি না-লাভ না-ক্ষতির অবস্থায় পৌঁছতে পারে না। ফলে ব্যাংকের টাকার অপচয় হয়।

৫। কেন্দ্রীয় সরকার আবগারি শুল্ক রেহাইয়ের সুপারিশ (রুগ্ন শিল্পের পুনরুজ্জীবনে) করার ক্ষমতা বি আই এফ আর দিয়েছে, কিন্তু অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মাঝারি স্তরের অফিসারদের কাছে যেতে হয়। ফলে অনেক দেরি হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত উদ্বৃত্ত জমি বিক্রির প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারগুলিকেও রাজি করান কঠিন বলে বি আই এফ আর মন্তব্য করেছে।

শ্রমিকদের প্রসঙ্গে বি আই এফ আর জানাচ্ছে, 'রুগ্ন শিল্প বন্ধ হলে যারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা হল শ্রমিক···কাজেই সাধারণত তারা খুবই সহযোগিতা করে।···তারা মোটামুটি র‍্যাশানালাইজেশনের (অর্থাৎ ছাঁটাই) দাবি মেনে নেয়। বি আই এফ আর সাধারণতঃ পরিচালকবর্গ ও শ্রমিকদের মধ্যে কমপক্ষে তিন বছরের এক দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তির উপর জোর দেয়। যখন

তাদের মজুরি একই থাকবে বা ছাঁটাই হবে। অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার ভিত্তিতে তুলনা করলে শ্রমিকরা সেই পক্ষ "যারা সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগ করে।"

পুনরুজ্জীবনের পদ্ধতি ঃ নানা পদ্ধতির মধ্যে দুটির উপর বি আই এফ আর বিশেষ জোর দিয়েছে (১) সংযুক্তিকরণ ও পরিচালক পরিবর্তন (২) শ্রমিক সমবায়।

১। সংযুক্তিকরণ ও পরিচালক পরিবর্তন ঃ ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বি আই এফ আর ২৩টি ক্ষেত্রে পরিচালক পরিবর্তন করেছে ও ২৮টি ক্ষেত্রে অ-রুগ্ন শিল্পের সাথে সংযুক্তি অনুমোদন করেছে।

২। শ্রমিক সমবায় ঃ বি আই এফ আর জানাচ্ছে 'সিকা' আইনে যেখানে যেখানে সম্ভব শ্রমিক সমবায়ের পরিচালনায় পুনরুজ্জীবনের সুপারিশ করা হয়েছে। ১৯৯১-এর ৩০ শে জুন পর্যন্ত বি আই এফ আর তিনটি কি চারটি ক্ষেত্রে শ্রমিক সমবায়ের স্কিম তৈরি করতে পেরেছিল। এই প্রসঙ্গে বি আই এফ আর সুপরিচিত কামানি টিউবসের কথা বলেছে।

সমবায় প্রচেষ্টায় রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতা সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সে সম্পর্কে বি আই এফ আর-এর নিজের মতামত হল ঃ

"দুর্ভাগ্যক্রমে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেখানে পরিবেশ অনুকূল থাকায় রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন শ্রমিক সমবায় গঠনের উদ্যোগে সমর্থন জানায়। রাজ্য সরকারগুলি আদৌ সাড়া দেয়নি এবং আমাদের পরামর্শে নিরুত্তাপ থেকেছে। শ্রমিক-মঙ্গলে গভীর উৎসাহের সাথে শপথ নিচ্ছে, শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশগ্রহণের দাবিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরছে এই ধরনের রাজ্য সরকারগুলির পক্ষেও শ্রমিক সমবায়গুলিকে সমর্থন করা সম্ভব হচ্ছে না, যেগুলিকে বি আই এফ আর বাস্তবোচিত মনে করে।" বি আই এফ আর জানাচ্ছে, তাঁর পরামর্শে আই ডি বি আই শ্রমিক সমবায়-গুলিকে সহজশর্তে সহায়তা দানের জন্য ১০ কোটি টাকার একটি তহবিল তৈরি করেছে। তবে কয়েকটি শর্ত আছে।

প্রথমত যথাসম্ভব একটি মাত্র ইউনিয়ন থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত শিল্প ইউনিটটিকে চালু অবস্থায় থাকতে হবে।

তৃতীয়ত রাজ্য সরকারের শেয়ার নিতে হবে ও টাকা দিতে হবে এবং শ্রমিকদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে হবে।

চতুর্থত পরিচালনার ক্ষেত্রে পেশাদারী যোগ্যতার ব্যক্তিকে নিতে হবে এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টর শ্রমিক সহ অন্য আরও অনেককে নিয়ে করতে হবে।

কোম্পানি বিক্রি

বি আই এফ আর-এর কোম্পানি বিক্রি করার ক্ষমতা আছে। যেখানে গুটিয়ে ফেলার হুকুম হয়েছে সেইসব ক্ষেত্রে একটা ধরাবাঁধা সমালোচনা হচ্ছে। গুটিয়ে ফেলার কাজটা করতে বড় দেরি হয়। চালু প্রতিষ্ঠান (going concern) হিসেবে বিক্রি করতে পারলে উৎপাদন ক্ষমতাকে সুরক্ষিত করা যায়। এই সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি রাজ্য অর্থলগ্নী সংস্থাগুলোর মতো কেন্দ্রীয় লগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলোরও এই ক্ষমতা থাকে যে বি আই এফ আর হুকুম দিলে তাদের টাকায় কারখানার যেসব সম্পত্তি কেনা হয়েছিল সেগুলোর দখল নিয়ে বিক্রি করে দিতে পারবে, তারপর সেই অর্থ পাওনাদারদের দিয়ে দেওয়ার জন্য হাইকোর্টে জমা রাখা হবে।

ব্যাঙ্কের লোকসান ঃ

ব্যাঙ্কের লোকসান প্রসঙ্গে বি আই এফ আর নজির হিসেবে বড় বড় শিল্পপতি গোষ্ঠীর (নাম না দিয়ে) কয়েকটির কথা বলেছে। বি আই এফ আর যেখানে যতটুকু সম্মতি জানিয়েছে তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ ঋণ মকুব করে দেওয়া হয়েছে। এইসব শিল্প গোষ্ঠীগুলির অরুগ্ন ও রুগ্ন দু-রকম শিল্পই আছে। এই সমস্ত রুগ্ন শিল্পগুলোর ঋণ (২১৭ কোটি টাকার উপর) ব্যাঙ্ক মকুব করে দিয়েছে অথচ একই গোষ্ঠীরই অন্য উদ্যোগে ব্যাঙ্ক আরও টাকা ঢালছে।

সিকা আইনের সংশোধন ঃ

বি আই এফ আর সিকা আইনের নিম্নলিখিত সংশোধনীগুলি দাবি করেছে।

(১) রুগ্ন শিল্প সংস্থার ক্ষেত্রে ৭ বছরের বদলে ৫ বছর হলেই রুগ্ন ঘোষণা করা ও পরপর দুবছর নগদ লোকসানের শর্ত তুলে দেওয়া।

(২) যাদের ৫০% ও তার বেশি নেট ওয়ার্থ ক্ষয়ে গিয়েছে বি আই এফ আর-এর কাছে তারা রিপোর্ট করবে। উক্ত কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে বি আই এফ আর যে ক্ষমতা চেয়েছে—(ক) নেট ওয়ার্থের ক্ষয় রোধ করার জন্য ইতিমধ্যেই কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে কোম্পানিকে তা বি আই এফ আর কে জানাবে, (খ) কোম্পানি, কেন্দ্রীয় সরকার, অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান, তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক ইত্যাদিকে বিভিন্ন ছাড় ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা বি আই এফ আর চেয়েছে, (গ) কোম্পানির কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিমতো কাজ হচ্ছে কিনা সেই সম্পর্কে রিপোর্ট চাইবার ক্ষমতা এছাড়া বি আই এফ আর-এর অনুমতি ছাড়া কোনও কোম্পানির সম্পত্তি বেচতে না পারা এবং নিজেদের খুশিমতো দামে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে না পারা।

রুগ্নতা কমানোর জন্য বি আই এফ আর-এর পরামর্শ ঃ

(১) কোনও শিল্প স্থাপনের আগে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত রিপোর্ট তৈরি করতে হবে, (২) উপযুক্ত মানের পরিচালনার উপর জোর, বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীত করা ও পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গি, (৩) ব্যাঙ্ক ও অর্থলগ্নী

সংস্থার নজরদারি (৪) বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীগুলি যাতে তাদের রুগ্ন উদ্যোগগুলিতে আরও সক্রিয় হয় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, (৫) শ্রমিক সমবায়কে উৎসাহদান এবং ব্যক্তি মালিকরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ছাড় ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পায় তার থেকেও বেশি সাহায্য দেওয়া, (৬) ছাঁটাই শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য পাওনা মেটানোর জন্য এবং ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনঃপ্রশিক্ষণ ও নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল গড়ার উদ্দেশ্যে সমস্ত চালু শিল্পের উপর কর বা সেস ধার্য করা। বস্ত্রশিল্পের ত্রাণ তহবিল ইতিমধ্যেই রয়েছে। সেই ব্যবস্থাই অন্যান্য শিল্পে প্রসারিত করা, (৭) যে রুগ্ন শিল্পগুলি চালিয়ে যাবার উপযুক্ত অবস্থায় থাকবে সেগুলিকে লিকুইডেটরের হাতে দিয়ে টুকরো টুকরো করে বিক্রি করার বদলে 'চালু সংস্থা' হিসেবে বিক্রি করা।

শাস্তি ঃ

"সিকা আইনে তছরুপ ইত্যাদির কারণে শাস্তির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে তার বাস্তবপ্রয়োগ করা যাচ্ছে না। এব্যাপারে ব্যাঙ্ক ও অর্থলগ্নী সংস্থাগুলি নজর রাখছে না। এব্যাপারে ব্যাঙ্ক ও অর্থলগ্নী সংস্থাগুলির আরও তৎপর হওয়া প্রয়োজন যাতে সিকার ২৪ ধারায় মামলা রুজু করা যায়।

সিকা ও বি আই এফ আর প্রসঙ্গে নাগরিক মঞ্চের বক্তব্য ঃ

১৯৯১ সালের ১৫ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীকে যে স্মারকলিপি মঞ্চের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল এবং ঐ বছরেরই ৭ এপ্রিল বি আই এফ আর-এর চেয়ারম্যানের কাছে যে দাবিগুলি করা হয়েছিল ঃ

(১) কোম্পানি গুটিয়ে ফেলার হুকুম বা সুপারিশ করার ক্ষমতা বি. আই. এফ. আর-এর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া উচিত। শুধু পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে মত দেওয়ার অধিকার তার থাকা উচিত।

(২) বি আই এফ আর-এর প্রস্তাবিত পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা মালিকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

(৩) নিজ নিজ শিল্পের রুগ্নতা সম্পর্কে বি আই এফ আরকে জানান ও পুনরুজ্জীবন-পরিকল্পনা পাঠানর অধিকার শ্রমিকদের থাকা উচিত।

(৪) বোর্ডের সামনে শুনানির সময় গোপন ব্যালটে নির্বাচিত শ্রমিক প্রতিনিধির উপস্থিত থাকার অধিকার আবশ্যিক হওয়া উচিত। এর জন্য বি আই এফ আর-এর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন উঠিয়ে দেওয়া উচিত।

(৫) রুগ্নশিল্পের ডিরেক্টর বোর্ডে আইনবলে বি আই এফ-এর যে প্রতিনিধি থাকবেন নির্বাচিত শ্রমিক প্রতিনিধির সঙ্গে পরামর্শ করা তার পক্ষে বাধ্যতা-মূলক করতে হবে। এই বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধিদেরও রাখতে হবে।

(৬) আই ডি আর অ্যাক্ট অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প অধিগ্রহণের সময়সীমা ১৫ বছরের বেশি হওয়া দরকার।

(৭) কারখানার রুগ্নতার জন্য যে বা যারা ঐ সময় পরিচালনায় (ব্যাঙ্ক ও অর্থলগ্নীসংস্থা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য) ছিল, তাদেরই বি আই এফ আর-এর অপারেটিং এজেন্সি নিয়োগের ব্যবস্থা তুলে দেওয়া উচিত।

(৮) পশ্চিমবঙ্গে রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা অত্যধিক বলে কলকাতায় বি আই এফ আর-এর স্থায়ী বেঞ্চ থাকা উচিত।

(৯) শুনানির সময় অ্যাপিলেট অথরিটির কাছে একজন নাগরিক প্রতি-নিধি রাখা উচিত।

(১০) শ্রমিকদের বক্তব্য শোনা ও স্কিমের প্রস্তাব তাদের জানানো বি আই এফ আর-এর পক্ষে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(১১) অপরাধী পরিচালকবর্গ, মালিক বা প্রোমোটারের যদি কোন সম্পত্তি থাকে, সেটা ক্ষতিপূরণ বাবদ ক্রোক করতে হবে।

সিকা আইনানুযায়ী অসৎ পরিচালক ও মালিকদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা বি আই এফ আর-এর আছে। কিন্তু তাদের দাবি, যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণের অভাবে তারা প্রায় কোন ক্ষেত্রেই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। অথচ ১৯৯১ সালের ৭ এপ্রিল নাগরিক মঞ্চ বি আই এফ আর-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান গণপতিকে সিকা আইনের 15, 15 (1), 20A এবং 24 ধারা অনুযায়ী দুটো কোম্পানির তথ্য প্রমাণ দিয়ে তদন্ত দাবি করেছিল। কিন্তু বি আই এফ আর এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয় নি।

ওঙ্কার গোস্বামী ও বি আই এফ আর-এর রিপোর্টের প্রেক্ষিতে নাগরিক মঞ্চের বক্তব্য

* বি আই এফ আর বা ওঙ্কার গোস্বামী রিপোর্টে ব্যাঙ্ক, অর্থলগ্নী সংস্থা ইত্যাদির ক্ষতির উল্লেখ থাকলেও কোম্পানীর রুগ্নতার কারণে যারা সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন সেই শ্রমিকদের ক্ষতিগ্রস্ততার কোনও উল্লেখ নেই।

* ওঙ্কার গোস্বামী রিপোর্টে "অপব্যবহারের মূল্য" (Opportunity Cost) নগদ লোকসানে কষা হয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্যের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি। একটা দেশের শিল্প নীতির এই যে দৃষ্টিভঙ্গি শিল্প বা ব্যক্তি কারোরই স্বার্থরক্ষা করবে না। ওঙ্কার গোস্বামীর শিল্প সুস্থ করার এই মনোভাব শিল্প নিয়ে ফড়ে বা বানিয়া দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক।

* গোস্বামী সরকারের পুঁজি বিনিয়োগের সমালোচনা করেছে। কিন্তু তার জানা নেই পুঁজি বিনিয়োগ উন্নত দেশগুলোও করে থাকে। দায়িত্বশীল হলে গোস্বামী কমিটি সুপরিচালনা, সঠিক বিনিয়োগ, নজরদারি ও অপব্যয় রোধে বিকল্প কোনও ব্যবস্থার কথা বলতেন।

* বি আই এফ আর রিপোর্টে রুগ্নতার সম্ভাবনা আগেই জানাবার ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। অথচ শ্রমিকদের (unsecured creditor) শিল্প রুগ্ন হয়ে পড়লে জানার বা জানানোর জন্য কোনও সুপারিশ করা হয়নি।

* গোস্বামী কমিটির শ্রমিকদের দ্রুত প্রাপ্য পাওয়ার জন্য যে রিকভারি ট্রাইবুনালের সুপারিশ করেছে তা আপাতভাবে শ্রমিক স্বার্থরক্ষাকারী সুপারিশ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ওয়াইন্ডিং আপ ট্রাইবুনালে কোনও কোম্পানি পাঠানোর ক্ষেত্রে বি আই এফ আর-এর 'চালু শিল্প' হিসাবে চিহ্নিত করার ফলে বিক্রিতে বিলম্ব হওয়ার জন্য তাঁদের আপত্তিই প্রমাণ করে তারা আসলে শ্রমিক বা শিল্প কোনটিরই পক্ষে নয়। কোম্পানি টুকরো টুকরো করে বিক্রি করে দেওয়ার পক্ষে তাদের সুপারিশই কমিটির শ্রমিক ও শিল্পবিরোধী খামখেয়ালী চরিত্রেরই প্রমাণ দেয়।

* গোস্বামী কমিটির রিপোর্টে বি আই এফ আর-এর শ্লথ গতির জন্য শ্রমিকদের হয়রানির উল্লেখ দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, গোস্বামী কমিটি শ্রমিকদের পক্ষেও কিছু সুপারিশ, করেছেন। কিন্তু কমিটির রিপোর্টে, অর্থাৎ প্রধান প্রধান শহরগুলোতে বি আই এফ আর বেঞ্চ গঠন—যা করলে শ্রমিকদের হয়রানি কমতে পারে তার কোনও উল্লেখ নেই।

* অসাধু প্রমোটারদের সিকা আইনের ধারায় শাস্তি দিতে না পারার জন্য বি আই এফ আর তথ্য প্রমাণ না পাওয়ার যে অজুহাত দিয়েছে তা সত্যি নয়। ১৯৯০ সালের ৭ এপ্রিল তিনটি কোম্পানি সম্বন্ধে তথ্য দিয়ে তৎকালীন বি আই এফ আর চেয়ারম্যানকে নাগরিক মঞ্চ স্মারকলিপি দিয়েছিল। তিনি কোন ব্যবস্থা নেননি।

* ওংকার গোস্বামী সুপারিশ 25(N) ও 25(O) ধারানুযায়ী ক্লোজার (আসলে ছাঁটাই) করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির অনুমতি নেওয়ার বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়া উচিত। গোস্বামী কমিটির হয়তো জানা নেই যে লকআউটের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কমিটি ক্লোজার বা লকআউট বেআইনি ঘোষণা করার সুপারিশ করেননি। শ্রমিক স্বার্থ মাথায় থাকলে সেটাই করতেন। এই ধারা দুটিই প্রমাণ করে কার স্বার্থে গোস্বামী কমিটির রিপোর্ট।

* যারা যারা ভেটো প্রয়োগ করে পুনর্বাসনকে বিলম্বিত করে তাদের দলে গোস্বামী শ্রমিকদেরও ফেলেছেন। শ্রমিক ও মালিক উভয়কেই একই লাইনে দাঁড় করিয়েছেন। এটা একেবারেই ঠিক নয়। প্রথমত শ্রমিকরা বিলম্ব করে না। শিল্প চালু করার ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি চিন্তা থাকে শ্রমিকদের। তাঁরা তখনই আপত্তি করেন যখন তাঁদের পেটে হাত পড়ে।

এল এল দত্ত-র 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকনেস' বইটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

৭. ব্যালান্সশিট : বার্ষিক আর্থিক চিত্র (সম্পদ, দেনা, লাভক্ষতি ইত্যাদি)।

ক. প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট : প্রতি বছরের শেষে বিগত বছরের লাভক্ষতির হিসাবে।

৮. ক. সিকিওরড্ ডেট (debt) : বন্ধকী ঋণ।

খ. আনসিকিওরড্ ডেট (debt) : সুদের শর্তে যে ঋণ পাওয়া যায়।

৯. ক্যাশ লস : নগদ লোকসান।

১০. নেটওয়ার্থ : মূল সম্পদ (সঞ্চিত পুঁজি ও মোট শেয়ার পুঁজি)।

১১. শেয়ার ক্যাপিটাল : শেয়ার পুঁজি। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার বা মালিকরা কত টাকা দিয়েছে।

১২. রিজার্ভ ক্যাপিটাল : সঞ্চিত পুঁজি। অতীতে অর্জিত লাভের অংশ যেটা ডিভিডেন্ডের মাধ্যমে শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় নি।

১৩. ডেপ্রিসিয়েশন : যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ক্ষয়বাবদ টাকা। এই খরচ নগদে হয় না বলে লাভ হিসেব করার সময় ডেপ্রিসিয়েশনকে খরচ হিসেবে ধরা হয় না।

১৪. উইন্ডিং আপ-লিকুইডেশন : কোম্পানি গুটিয়ে ফেলা বা উঠিয়ে দেওয়া। গুটিয়ে ফেলার হুকুম দেওয়ার আগে হাইকোর্ট কোম্পানির জমি, যন্ত্র ইত্যাদি বিক্রি করাবে (এখন বি আই এফ আর এটা করতে পারে) এবং পাওনাদারদের পাওনা যথাসম্ভব মিটিয়ে দেবে। তারপর কোর্ট উইন্ডিং আপ-এর মাধ্যমে কোম্পানিটির মৃত্যু ঘোষণা করবে।

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮৯
দ্বিতীয় (পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত) প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
প্রকাশক : নাগরিক মঞ্চ ● ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড
কলকাতা-৭০০০৮৫, রুম নং-৭, ব্লক-বি
মুদ্রক : প্রিন্টিং উদ্যোগ, ১৯ডি, এইচ/চৌদ্দ গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৬
দাম : চার টাকা